প্রকাশক—
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল

১ম পৃঃ হইতে ৮৪ পৃঃ পর্য্যন্ত ২নং নিবেদিতা লেন, ভট্টাচার্য্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে অমূল্য ভট্টাচার্য্য এবং বাকী অংশ ১৯৫।১এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দি ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিমিটেড হইতে শ্রীবিজয় মোহন রায় বর্ম্মণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

জাতি-সংগঠন

—সংগঠন-কার্য্য—

আমাদের বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা হইতেছে, ভারতের জাতীয়-জীবন সংগঠন। ভারতবর্ষে নানাপ্রকারের ও নানাধর্ম্মের জাতির বাস। তাহারা সভ্যতা ও চর্চ্চার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের সকলকে এক সভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া ঐক্যসাধনান্তর একজাতীয়ত্ব লাভ করাই জাতীয়-জীবন সংগঠন প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, তাহা কি প্রকারে সংসাধিত করা যাইতে পারে। এইস্থলে স্পষ্ট করিয়া বোধগম্য করা প্রয়োজন যে, "একজাতীয়ত্ব লাভ" মধ্যে জাতীয়-জীবনকে স্বায়ত্তাধীন করার অর্থ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। স্বাধীন রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থ-নীতিক ঘটনার সমবায়ে জাতীয়-জীবনে ইতিহাসের ও সভ্যতার যে ক্রমবিকাশের স্ফূর্ত্তিলাভ করে তাহাদ্বারাই একজাতীয়ত্ব সাধিত হয়।

এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভারতে অনেকদিন হইতেই নানাপ্রকারের প্রচেষ্টার অবতারণা করা হইয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্য হইতে আমরা এখনও বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছি। আমরা এই কার্য্যকে যতটা সহজ মনে করিয়াছিলাম; অভিজ্ঞতার ফলে জানিয়াছি তাহা তত সহজ নহে। বস্তুতঃ, জাতীয় জীবনের এই অবস্থা লাভ অনায়াসলব্ধ বস্তু নহে; ইহা বহুল ক্লেশসাধ্য বস্তু। এই জন্যই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন উঠে, কি উপায়ে আমরা গন্তব্য পথে উপনীত হইতে পারি? উপায় হয়ত নানাপ্রকারের থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ফল কর্ম্মীর কার্য্যকারিতার ও কর্ম্মনিপুণতার উপর নির্ভর করে। আজ পর্য্যন্ত যে আমাদের জাতীয় জীবন গন্তব্য স্থলের নিকটবর্ত্তী হয় নাই তাহার প্রধান হেতু কর্ম্মীদের কর্ম্মনিপুণতার অভাব বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। এতদিন হইতে যে সব উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তপথ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ভারতীয় জাতীয় জীবন গঠনের পথে সেইগুলি এক একটি সোপান বলিয়া গণ্য করা বিধেয়! কারণ, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যে প্রকার উন্নতি সাধন হইতেছে ও জাতীয়-জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইতেছে তদ্বারা আমরাও জাতীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিতেছি ও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতেছি। কোন একটি উপায়কে সনাতন ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া থাকিলে তাহা কেবল গোঁড়ামীত্বে পরিণত হয় ও কার্য্যহন্তা হয়। একটি পন্থাকে চিরন্তনব্যাপী প্রকৃষ্টপন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়া অন্যপন্থা

ও প্রণালীর বিঘ্ন উৎপাদন করিলে তাহা সনাতনবাদীদের স্বার্থেরই পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে। এইজন্য একটি মানবসমষ্টির জাতীয়-জীবন সংগঠিত করিবার জন্য বিভিন্নপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মানবসমাজ স্থানুবৎ স্থিতিশীল নহে, তাহা পরিবর্ত্তনশীল; হয় তাহা অগ্রসর হইতেছে, না হয় তাহা পশ্চাৎপদ হইতেছে। শেষোক্ত গতি মৃত্যুরই লক্ষণ। যে মানবসমষ্টি এজগতে শ্রীসমৃদ্ধির সহিত বাস করিতে চাহে, তাহাকে বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমাগত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সমাজে নূতন আর্থনীতিক ও তজ্জন্য সামাজিক সমস্যার উদয় হইলে তাহার নিরাকরণ করা প্রয়োজন। বাহির হইতে সভ্যতার ও চর্চ্চার নূতন উদ্দীপনা আসিলে তাহাকে স্বকীয় করিয়া জীর্ণিভূত করা প্রয়োজন। কূর্ম্মবৎ প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া জগতের নূতন ভাবস্রোত হইতে নিজেকে দূরে রাখিলে শেষে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয় · সব জাতি জগতের যুগধর্ম্মানুযায়ী নূতন চর্চ্চা ও উদ্দীপনা নিজ সমাজশরীর মধ্যে গ্রহণ না করিতে পারিবে অর্থাৎ তদ্বারা নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিবে তাহারা চিরকালই জগতের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে। "চৈনিক প্রাচীর" দিয়া কোন জাতি আর নিজেকে লুক্কায়িত রাখিতে পারিতেছে না, সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর আমরা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" হইয়া আছি। বিংশ শতাব্দীর ভাবসমূহ আমাদের দ্বারে আসিয়া ক্রমাগত আঘাত

করিতেছে আমরা কতদিন তাহার বেগ প্রতিরোধ করিতে পারিব? আমাদের চক্ষের উপর তুর্কি ও চীন উলটপালট হইয়া যাইল! পূর্ব্বতন কূর্ম্মাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা দ্রুতশীল গতিতে নিজেদের পরিবর্ত্তিত করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে ভারতের বিবর্ত্তনের গতির তুলনা করিলে বোধগম্য হয়, ভারত জগতের কত পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছে!

আর্থনীতিক ভিত্তির উপর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেইজন্য কেহ বলেন "ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যার" দ্বারাই সমাজ পরিচালিত হয়, অন্য পক্ষে কেহ বলেন "ভাবের দ্বারাই সমাজ পরিচালিত হয়।" কিন্তু উভয় ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী নহে, উভয়েই একস্থলে মিলিত হয়, তাহা "স্বার্থ" অর্থাৎ স্বার্থ দ্বারাই সমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই "স্বার্থ"-প্রণোদিত হইয়াই আজ ভারত অপর দ্বারা লুণ্ঠিত, শোষিত ও পদদলিত হইতে চাহিতেছে না। আজ ভারত স্বীয় গৃহে স্বয়ং কর্ত্তা হইতে চাহে, স্বীয় ভাগ্য নিজ হস্তে নিয়োজিত করিতে চাহে। ইহাই হইতেছে ভারতের "জাতীয়-সমস্যা"।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, কি প্রকারে এই সমস্যার সমাধান হইবে? চারিদিকেই পর্ব্বত প্রমাণ অন্তরায় দৃষ্ট হইতেছে, ভারতবাসী তাহা নিরীক্ষণ করিয়া ভীতচকিত হৃদয়ে হা হুতাস করিতেছে। কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য যে সব বিভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল বা এক্ষণেও অবলম্বিত হইতেছে তাহা দ্বারা জাতীয়

জীবন এখনও গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারে নাই। ইহার কারণ, কর্ম্মীর কর্ম্মনৈপুণ্যের অভাব বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষে ত্রিশকোটির উপর লোকের বাস। তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, বাকি সব নিরক্ষর ও গণশ্রেণীভুক্ত। দেশের এই "বেশীরভাগ অধিবাসীর" মধ্যে কি এতদিন জাতীয় মুক্তি, জাতীয় জীবন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার সংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল? এই সংবাদ কি এতদিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সখের ব্যাপার স্বরূপ আলোচিত হইত না? যাঁহারা অগ্রেই বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের একজাতীয়ত্ব লাভ করিতে হইবে, তাহারা কি তাহার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করিয়াছিলেন ও জনসাধারণকে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করিতেছিলেন? যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এতদিনে ভারতের জাতীয় ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

এতদিনে কেহ কেহ বুঝিতে পারিতেছেন যে, "ভারতবাসী" সংজ্ঞা কেবল মুষ্টিমেয় অর্থশালী শিক্ষিত লোকেতেই পর্য্যবসিত নহে; তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরে বিশাল জনসমূহ রহিয়াছে, যাঁহারা অশিক্ষিত, রুগ্ন, অন্নক্লিষ্ট, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত, নানা প্রকারের বন্ধনে ও অত্যাচারে নিষ্পেষ্ট, শোষিত ও লুণ্ঠিত ভারতবাসীর মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যাই বেশী। পুরুষানুক্রমে ইঁহারা নানাপ্রকারের অত্যাচারে মৃতপ্রায় হইয়া আছে। ইঁহাদের এতদিন কে সংবাদ রাখিয়াছিল? ভারতে কত রাজত্ব ও

সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছে, ভারতের বক্ষ দিয়া কত প্রলয়কাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু এই নিরক্ষর গণবৃন্দকে উত্তোলিত করিবার জন্য কোন শক্তি কি কখন চেষ্টা করিয়াছে? দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে, অত্যাচারের তাড়নায় ইহারা অনেকস্থলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে; হয়ত তাহাতে আপাততঃ কষ্টের লাঘব হইয়াছে কিন্তু তাহারা কি তদ্দারা জীবনের উচ্চস্তরে ও উচ্চ সভ্যতায় উন্নীত হইয়াছে? ভারতের বেশীর ভাগ অধিবাসী চিরকালই পদদলিত হইয়াছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাসস্থল বাসন্তীচন্দ্রিকা ধৌত অট্টালিকা হইতে পারে, তন্মধ্যে বিদ্যুতের আলোক জ্বলিতে পারে, কিন্তু পদদলিত গণবৃন্দের জীর্ণগৃহে অন্ধকারই বিরাজ করে (আসামের গরীব গণশ্রেণীর লোকেরা রাত্রি হইলে আলোক বিহীন গৃহেই জীবন যাপন করে)।

যাহাদের লইয়া একজাতীয়ত্ব গঠিত হইবে, যাহাদের জন্যই জাতীয় মুক্তি প্রয়োজন তাহারা এতদিন পর্য্যন্ত নগণ্য হইয়া রহিয়াছে! আর শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে কেবল "ছেঁদো কথায়" বক্তৃতা করিয়া দেশ স্বাধীন করেন! ইঁহারা যদি নিজেদের বিদ্যা ও ধনগর্ব্বে অহঙ্কৃত হইয়া বলেন, "দেশের গণশ্রেণীরা গণনার মধ্যে আসে না" তাহার উত্তর বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর চারিদিক হইতে আসিতেছে এবং ভারতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া উত্থিত হইতেছে "গণশ্রেণীই ভারতের সর্ব্বস্ব"। শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট দেশের সীমা তাহাদের শ্রোতাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, দেশের

কার্য্যের দৌড় তাহাদের বক্তৃতার উষ্মতায়ই পর্য্যবসিত হয়! ইহা না হইলে ভারত আজ পর্য্যন্ত তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে!

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জাতীয় কার্য্যে এক নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ করা প্রয়োজন। যাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন, "দেশ" অর্থে দশ অর্থাৎ জনসাধারণ, তাঁহাদের সেই "দশের" সন্ধানে বহির্গত হইতে হইবে। ভারতের "বেশীর ভাগ অধিবাসীর" সন্ধান ধনীর অট্টালিকায় মিলিবে না, এবং "বার লাইব্রেরী" ও "চেম্বার্স অফ্ কমার্সে"ও মিলিবে না। তাহাদের সন্ধান ঐ রৌদ্রতপ্ত মাঠে, ঐ ঘর্ম্মসিক্ত কারখানায়, ঐ পর্ণকুটিরে, ঐ জীর্ণ বিপনী গৃহে, ঐ ধনীর দাস শ্রেণীর মধ্যে, ঐ যেস্থানে দারিদ্র্য, ও মূর্খতা বিরাজ করিতেছে, ঐ যে আবর্জ্জনা ও পূতিগন্ধময় স্থান, ঐ যে দুর্গন্ধ ও দুষ্ট বায়ুযুক্ত পর্ণ-গৃহ যথায় মনুষ্য ও জন্তু এক সঙ্গে রাত্রি যাপন করে, ও যথায় সামান্য চাকরিজীবি ব্যক্তি দারিদ্র্যের আশিবিষে জর্জ্জরিত ও নিরাশাপূর্ণ জীবনে সংসারধর্ম্ম করিতেছে, এই সব স্থানেই ভারতের "বেশীরভাগ লোকের" অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভারতের হৃদয়স্থল ইঁহাদের মধ্যেই নিহিত আছে। যে প্রকারে হৃদয়যন্ত্র অচল হইলে চেতনাশক্তি নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ ভারতের এই হৃদয় যন্ত্র অচল হইলে জাতীয় জীবনীশক্তিরও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

আজ ভারতের এই হৃদয়যন্ত্র নিস্তেজ হইয়া জড়বৎ হইয়াছে, সেই জন্য জাতীয়শরীরও নিস্পন্দতা লাভ করিয়াছে। এই জন্যই

জাতীয়তা গঠনের সর্ব্বপ্রকারের প্রচেষ্টা বিফল হইতেছে। এই সত্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যতদিন আমরা ভারতের হৃদয়স্থল স্পর্শ করিতে না পারিব ততদিন আমরা একটা জাতিরূপে সংগঠিত হইতে পারিব না। এই সত্যহৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আমাদের জাতীয়-জীবন সংগঠনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া দৃষ্ট হয় যে ভারতে বিভিন্ন ভাষার ও ধর্ম্মের লোকের বসবাস। ভারতবর্ষীয় মনুষ্যসমাজ কেবল ধর্ম্মের বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত নয়, সমাজ আবার বিভিন্ন সামাজিক স্তরে বিভক্ত। ইহা ব্যতীত, ভাষার বিভিন্নতা জন্য বিভিন্ন জনপদের লোক বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সব কারণে ভারতের সমস্যা এত জটীল হইয়াছে। এইসব কারণে ভারতে একজাতীয়ত্ব গঠনের পথে এত বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে।

প্রাচীনকালে কিন্তু যখন উত্তর ভারতের সমস্ত জনপদে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল ও সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তৎকালে এক রাজার শাসনাধীনে থাকিয়া হয়ত ভারতের সেই অংশ একজাতীয়তা লাভ করিয়াছিল। আবার, সমগ্র ভারত যখন একছত্র রাজার অধীনে থাকিয়া, এক আর্য্যসভ্যতার অন্তর্গত হইয়া এক ভাগ্য ও এক ইতিহাস গঠিত করিয়াছিল ভারত তৎকালে হয়ত একজাতীয়তা লাভ করিয়াছিল। তৎপরে বিভিন্ন জনপদে ক্রমবিকাশ দ্বারা বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হওয়াতে নিখিল ভারতের একত্বের বিঘ্নতা

উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্গে ঐ সব জনপদের ইতিহাসের গতিও বিভিন্ন হওয়ায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক পৃথক জাতির অভ্যুদয় হয়। এই প্রকারের ক্রমবিকাশের দ্বারাই বর্ত্তমানে "বাঙালী," "হিন্দুস্থানী", "মারাঠী", "পাঞ্জাবী" প্রভৃতি বিভিন্ন "জাতির" উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক জনপদের অধিবাসীরা স্বীয় ভাষাকে উচ্চাঙ্গের চর্চ্চিত ভাষাতে পরিণত করিয়া ও নিখিল ভারতীয় এক কেন্দ্রীভূত রাজনীতিক ইতিহাসের গতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাদেশিক ইতিহাসের বিবর্ত্তন দ্বারা প্রাদেশিক একজাতীয়ত্ব লাভ করিয়াছে। এই কারণ বশতঃ আজ বাঙালী, আসামী, উড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতির মধ্যে এত পার্থক্য বোধ হইতেছে।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন বশতঃ বর্ত্তমান যুগে ভারত আবার একছত্র শাসনাধীনে আসিয়াছে। আজ এক ইতিহাস ও চর্চ্চার সহিত এক ভাগ্য নিয়োজিত হওয়াতে ভারত আবার একজাতীয়ত্ব লাভের প্রয়াসী হইতেছে। আজ সর্ব্বপ্রদেশের ইতিহাসের গতি একই দিকে ধাবিত হইতেছে, এবং সকলকার স্বার্থ এক ; সেই জন্যই ভারত এক-জাতীয়তা লাভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু অন্যদিকে প্রাদেশিক জাতীয়তা নানা কারণ বশতঃ দৃঢ়ভাবে গঠিত হইতেছে, হয়ত এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে নিখিল ভারতের লোকবৃন্দকে কেন্দ্রীভূত এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হইবে না, হয়ত ভারত বিভিন্ন প্রাদেশিক জাতির "সংযুক্ত রাজ্যে" পরিণত হইবে ; কিন্তু ইহা ভবিষ্যতের ইতিহাসের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতের ইতিহাসের গতির উপর ইহা নির্ভর করে।

কিন্তু আজকাল এই বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম্মের পার্থক্যতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া একদল লোক ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতীয়তা গঠনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মভুক্ত ব্যক্তিরা অগ্রণী বলিয়া বোধ হয়। ইঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যেসব লোকেরা পৃথকজাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের উর্দ্দু ভাষা শিক্ষাদান করিয়া একত্রিত করিয়া "ভারতীয়-মুসলমান" জাতিরূপে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন অর্থাৎ পাঞ্জাবী মুসলমানদের যেরূপ উর্দ্দু ভাষা শিক্ষাদান করা হইতেছে, বাঙালী মুসলমানদেরও তদ্রূপ উর্দ্দু ভাষা শিখাইয়া একধর্ম্ম ও এক ভাষার জ্ঞানের দ্বারা যে ঐক্য স্থাপিত হইবে সেই ভিত্তির উপর ভারতীয় মুসলমান একজাতীয়ত্ব স্থাপন প্রয়াসী! কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া যান যে মাতৃভাষার টান বিদেশী ভাষার জ্ঞান হইতে বেশী। পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের জাতি-দের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা জন্য জাতিত্বের টান অপেক্ষা ধর্ম্মের টান আপাততঃ বেশী বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে যে ভাষার বন্ধন ধর্ম্মের টান অপেক্ষা বেশী। এই অনু-ষ্ঠান কেহ নিজের দেশের বাহিরে যাইলে প্রত্যক্ষ করিবেন। তৎ-পর, ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যার প্রভাব অন্যান্য বন্ধনাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ স্বার্থের বন্ধনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বন্ধন! এইজন্য বাঙ্গালা, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি চর্চ্চিত ভাষায় লোকসমূহের একাং-শের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অন্য ভাষা শিক্ষা করিয়া স্ব-প্রদেশীয়

অন্য লোকের সহিত বিবিধ বন্ধন অস্বীকার করিয়া, এই দুর্ব্বল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সুদূরের স্বধর্ম্মীর সহিত একজাতীয়তা স্থাপনপ্রয়াস বৃথা চেষ্টা মাত্র। কালের অভিজ্ঞতা এই ভ্রান্তির নিরাকরণ করিবে। ইঁহারা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিতে পারিবেন যে, স্ব-প্রদেশীয় অন্যান্য অধিবাসীদের সহিত ধর্ম্মের প্রভেদ থাকিলেও সুদূরের স্বধর্ম্মী অপেক্ষা প্রতিবেশী ও জাতি বিধর্ম্মীর সহিত নানাবিধ বন্ধনের টান বেশী। বাস্তব রাজনীতির মতে এইসব বন্ধন অস্বীকার না করিয়া প্রতিবাসীর সহিত মিত্রতা করা যুক্তিযুক্ত এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া একজাতীয়তা স্থাপনের জন্য প্রতিবেশীর সহিত একত্ব সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। ঐতিহাসিক—আর্থনীতিক ভাগ্যের ঐক্যত্ব মানব প্রতিবেশীরই সহিত ভোগ করে এবং তদ্দ্বারা একতা বা একজাতীয়তা সহজে স্থাপিত হয়। হিন্দুর বিষয়ও এই যুক্তি প্রযুজ্য। হিন্দু সমাজের অনেকে আজ মুসলমান সমাজের এই চেষ্টার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দুর মধ্যে এবম্প্রকারে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নিখিল-ভারতীয় হিন্দু একজাতীয়তা গঠনের প্রয়াসী হইয়াছেন। ইঁহারাও মুসলমানের ন্যায় আবৃত্তি করিতেছেন "আমি প্রথমে হিন্দু, তৎপরে ভারতবাসী!" এই প্রকারে নানাবিধ কিম্ভূত কিমাকার মত জনসাধারণে প্রচারিত হইতেছে—উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে স্বধর্ম্মীয় জনবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই সব আয়োজন!

আজকাল ভারতীয় একজাতীয়তা ও স্বরাজের কথা অপেক্ষা

সাম্প্রদায়িকত্ব ও সাম্প্রদায়িক-জাতীয়তার কথাই লোকমধ্যে প্রচারিত হইতেছে। দেশে যদিচ সাম্প্রদায়িকত্বের একটা হাওয়া বহিতেছে তত্রাচ ইহাকে ভারতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বলা যায় না, বরং ইহা বিবর্ত্তনের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া দেশকে বিপরীত পথে লইয়া যাইতেছে। যাঁহারা আজ স্বীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলেচ্ছু বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার ঢাক ঢোল পিটিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের সমাজের পদদলিত গণসমূহের উন্নতির জন্য কি আয়োজন করিতেছেন তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা যদি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে নিষ্পেষিত, লুন্ঠিত স্বধর্ম্মী গণবৃন্দের সামাজিক, আর্থনীতিক, দৈহিক, নৈতিক ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের হেতুর কিয়দংশ জনসাধারণের নিকট অবোধ্য হইত না। কিন্তু যে-সব সাম্প্রদায়িক বিষ প্রতিদিন উদ্গীরিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থান্বেষণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, "সাম্প্রদায়িকতা" শিক্ষিত ও অর্থসম্পন্নশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের প্রচেষ্টা মাত্র।

সাম্প্রদায়িকতার জন্মস্থান ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর ভাগ। তথা হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অন্যান্য প্রদেশে এই বিষ ছড়াইতেছেন। এই অনুষ্ঠানের মনস্তত্ত্বীক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমের জনবৃন্দ বৈদিকযুগ হইতে আজপর্য্যন্ত বিভিন্নকুলে বিভক্ত। এই বিভিন্নকুলে পরস্পরের

মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কলহে ব্যাপৃত থাকে। পাঠান জাতিদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত "বদলী" প্রথা লওয়া বর্ত্তমান। একজনের পিতামহকে আর একজনের পিতামহ অপমান বা তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে, ইহার প্রতিশোধ একদিন প্রথমোক্তের বংশধরেরা লইতে বাধ্য। এই প্রকারে বিভিন্ন কুলে কলহ বিদ্যমান। এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের প্রতিবিম্ব "বারা রাজপুত তেরা চুল্লাতে" দৃষ্ট হয়। হিন্দুদের মধ্যে যে সব প্রদেশে কুলের বিভিন্নতার প্রখরতা হ্রাস হইয়াছে, তথায় জাতিভেদের প্রখরতা দৃষ্ট হয়। সমাজতত্ত্বীক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, বর্ব্বর সমাজের প্রথানুযায়ী কুলের বিভিন্নতার জন্য কুলের বাহিরের লোককে বিজাতীয় বলিয়া গণ্য করা এবং প্রয়োজন হইলে যাহার প্রতি "বদলী" প্রথা'ও প্রযুজ্য করা যাইতে পারে, এই মনোবৃত্তি, অপেক্ষাকৃত সভ্যসমাজে জাতিবৈষম্যে (হিন্দুসমাজে ইহাকে বর্ণবৈষম্য বলে) রূপান্তরিত হয়। তৎপর, এক কুলোদ্ভব লোকদের মধ্যে যে প্রকার কুলপ্রেমিকতা আছে তদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বীয়কুলের গুণগান করে এবং তাহার উন্নতি বিধান কল্পে চেষ্টিত থাকে, সেই মনোবৃত্তি আবার বর্ণভেদান্বিত সমাজে প্রত্যেক বর্ণের (জাতি) লোক বর্ণপ্রেমিকতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বীয় বর্ণের উন্নতি কল্পে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব করে। এই জন্যই একদিকে আমরা যে প্রকারে মাসুদ-পাঠান ও আফ্রিদি-পাঠানের, সিসোদিয়া-রাজপুত ও রাঠোর-রাজপুতের মধ্যে "বদলী" প্রথার কথা শ্রবণ করি, আর মালবীয় ব্রাহ্মণের সহিত

ঝাঝোতীয় ব্রাহ্মণের বা গৌড় ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রকারের বিভিন্নতা দর্শন করি, তদ্রূপ পশ্চিমে (প্রাচীন মধ্যদেশে) যথায় কুলপ্রভেদের প্রাধর্য্য হ্রাস হইয়াছে, তথায় কুলপ্রভেদ ও কুলপ্রেমিকতা, বর্ণপ্রভেদ ও বর্ণপ্রেমিকতাতে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য এইস্থানে ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থ পাঠশালা, রাজপুত কলেজ, আহির কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বদেশ-প্রেমিকতা এতদিন "বেরাদারির" মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বা এখনও আছে !

আজ এই সব প্রদেশেই সাম্প্রদায়িকত্ব মূল পত্তন করিয়াছে। এই স্থলের নেতৃবৃন্দেরা কুল, বর্ণ বিভাগের উপর ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকত্বের বিবর্ত্তন করিতে চাহেন। যে সব স্থানের জনসমূহ গোষ্টি, কুল ও জাতিতে বিভক্ত তথায় এক-জাতীয়তা আনয়ন করা তত সহজ নহে। একজাতীয়তা আনয়ন করিতে হইলে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসের প্রয়োজন অথবা শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের কার্য্যকারিতা নষ্ট করা দরকার। সমাজতত্ত্বীক মতানুসারে কুল ও জাতি বিভাগের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকত্ব আনিলে জনবৃন্দ একজাতীয়তার পথে অগ্রসর হইতে পারে না ; কারণ সাম্প্রদায়িকত্বে সেই পুরাতন মনস্তত্ত্বেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। কুল ও জাতিভেদের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলে সেই "আপন" ও "পর" ভাব ও তজ্জন্য "বদলী" প্রথাকেই রূপান্তরিত করিয়া রক্ষিত করা হয়। এই জন্যই সাম্প্রদায়িকত্ব একজাতীয়ত্বের অন্তরায়।

বঙ্গপ্রদেশে অতি প্রাচীন যুগেই গোষ্টি, কুল প্রভৃতি বৈষম্যত্য

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সকলে একটা "বাঙালী জাতিতে" পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বর্ণ বিভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রাথর্য্য নানাকারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে এতদিন কেহ বর্ণ বা জাতি প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা সুবর্ণবণিক বিদ্যালয় বা কেবল স্বীয় বর্ণহিতকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন নাই (আজকাল যে সব "ব্রাহ্মণ সভা" "কায়স্থ সভার" সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পশ্চিম ভারতের নকল, তাহাদের কার্য্যকারিতা বিশেষ নাই।) বাঙলার হিন্দুসমাজে যে সব অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান এতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা কুল বা বর্ণপ্রেমিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বাঙলায় সকলেই বাঙালী; তৎপ্রদেশে প্রাদেশিক একজাতীয়তা অতি পুরাতন কাল হইতে গঠিত হইয়াছে। এই "বাঙালী জাতির" মধ্যে যাহারা কালক্রমে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা আচার ব্যবহারে,রীতিনীতিতে, ভাবভঙ্গী ও ভাষাতে হিন্দু আত্মীয় ও প্রতি-বেশী হইতে বিশেষ পৃথক নহেন; আর যে সব গোষ্ঠি বাহির হইতে আসিয়াছেন তাঁহারাও "বাঙালীত্ব" প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধর্ম্ম ও তজ্জন্য সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পৃথক বটেন কিন্তু জাতি-তত্ত্ব ও সভ্যতা হিসাবে সকলেই এক। পাঞ্জাবে তিনপ্রকার ধর্ম্মের জন্য তিন প্রকারের অক্ষর প্রচলিত ও তিন প্রকারের সাহিত্য গঠিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে; এবং মধ্যদেশে ধর্ম্মের পার্থক্য বশতঃ দুই ভাষা ও দুই প্রকারের অক্ষর প্রচলিত; বঙ্গদেশে বহু-প্রকারের ধর্ম্মের প্রচলন থাকা স্বত্ত্বেও সকলেরই ভাষা এক, যাহা

একপ্রকার অক্ষরেই লিখিত হয়, এক সাহিত্য যাহা সর্ব্ব ধর্ম্মের লোক দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত ঐক্য আছে। এইজন্য বহুপূর্ব্বেই বঙ্গপ্রদেশে একজাতীয়ত্ব লাভ সংঘটিত হইয়াছে।

আজ একত্বপ্রাপ্ত এই বাঙালী জাতিকে ধর্ম্মের বিভিন্নতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহার ভাষা ভিন্ন করিবার চেষ্টা করা এবং তদ্দ্বারা বাঙলার একজাতীয়তা বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা ধর্ম্মান্ধতার পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানী ও স্বজাতি-হিতৈষীর কর্ম্ম নহে। বাঙলার অধিবাসীদের ধর্ম্মের বিভিন্নতা থাকিলেও আর্থনীতিক ঐক্যতা রহিয়াছে। প্রত্যেকের স্বার্থ এক সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। বাঙলার মুসলমান উর্দ্দু শিক্ষা করিলেও (সে উর্দ্দু আর এক নূতন ভাষা হইবে!) এবং পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানী মুসলমানের সঙ্গে একত্রে একমন্ত্রে ধর্ম্মোপাসনা করিলেও উভয়ে কখনও একজাতিতে সংগঠিত হইবে না এবং তাহারা নিজেদের হিন্দু প্রদেশীয়কে বাদ দিয়া সুদূর প্রদেশের লোকের সহিত এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কখন উভয়ে মিলিয়া একজাতীয়ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহা নর-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও ইতিহাস বিরোধী!

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে একত্রিত হইয়া একজাতীয়ত্ব গঠন করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেহ তাহাকে বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারিবে না। এক দেশের মধ্যে

এক ইতিহাস—ভাষা—অর্থনীতির ভাগ্যাধীন থাকিয়া দুইটা পৃথক একজাতীয়তা প্রাপ্ত জাতি গঠিত হইতে পারে না। যে প্রকারে নিখিল-ভারতীয় হিন্দু একজাতীয়ত্ব প্রাপ্তজাতির সংগঠন অসম্ভব, তদ্রূপ নিখিল-ভারতীয় মুসলমান একজাতীয়ত্বপ্রাপ্তজাতির সৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রকারের চেষ্টা ধর্ম্মান্ধতা প্রসূত হইতে পারে, শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত অহং-ভাব বা শ্রেণীস্বার্থ প্রসূত হইতে পারে কিন্তু ইহা সমাজ-তত্ত্বীক ও রাজনীতি-তত্ত্বীক নিয়মপ্রসূত নহে। তৎপর ইহা রাজনীতিক তথ্যবিরোধী, কারণ দ্বিখণ্ডিত গৃহ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। এবম্প্রকারের চেষ্টা ও তজ্জন্য বিসংবাদ এবং গৃহবিবাদ স্বরাজলাভের পথের কেবল অন্তরায় হইতেছে। আবার, অদ্য যাহা সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী-স্বার্থ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে তাহার সামঞ্জস্য কেবল স্বরাজ্যের অবস্থাতেই সম্ভব।

এক্ষণে কথা হইতেছে, কি প্রকারে এই সব বিরোধ মিটাইয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারের লোকদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিয়া একজাতীয়ত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইব? এইস্থলে একটি তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রশ্ন উঠে, এই সব কলহ কাহার দ্বারা উত্থিত হইতেছে! গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র ও সাংসারিক চিন্তায় উৎব্যস্ত গণশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতিতে থাকে। তাহাদের ধর্ম্মবিভেদ জনিত "আপন" ও "পর" ভাব হৃদয়ে জাগরিত থাকে না; কিন্তু বাহির হইতে কোনও শিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া তাহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত ধর্ম্মান্ধতা ও মনের সুপ্ত কুপ্রবৃত্তিসমূহে

ইন্ধন প্রদানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত করিলে তাহারা ক্ষিপ্ত হয়। এই সব ব্যাপার "সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার" নামেই অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় যে এই কার্য্য যথার্থ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য নহে, বরং ব্যক্তিগত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের শ্রেণীগত স্বার্থন্বেষণের চেষ্টাপ্রসূত, এবং অজ্ঞগণবৃন্দ এই সব ধূর্ত্তলোকদের হস্তের ক্রীড়নক হয়। এই সব অজ্ঞ লোকদের ইহাতে কিছুই লাভ নাই বরং তাহাদের লোকসান হয়। শিক্ষিত ধূর্ত্ত শোষকের দল ইহাদের ধর্ম্মান্ধতা ও অজ্ঞতাকে স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আমাদের রাজনীতিতে যে প্রকারে শিক্ষিত অর্থশালী শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ প্রতিবিম্বিত হয়, সাম্প্রদায়িকতাতেও তদ্রূপ। তাহাতে আরও নিম্নপ্রকারের স্বার্থ প্রতিধ্বনিত হয়! এইজন্যই ভাবুকের মনে এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইবে—এই সব বিঘ্ন নিরাকরণের উপায় কি? এই প্রশ্নের প্রধান উত্তর—ভারতের জাতীয় মুক্তির চেষ্টাকে শিক্ষিত শ্রেণীর একাধিপত্য হইতে বাহির করিয়া গণশ্রেণীর হস্তে প্রদান করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠনের কর্ম্মের স্রোত একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ না রাখিয়া "ভারতের বেশীরভাগ লোকের" মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে; অর্থাৎ যাহাদের লইয়াই ভারত তাহাদের সঙ্গেই কার্য্য করিতে হইবে। তাহাদের একটি সামাজিক—আর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে

সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক এক স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া একীভূত হইবে।

এই স্থলে আমাদের আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে ভারতীয় গণশ্রেণীর মধ্যে কর্ম্ম করা অর্থে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উত্তোলিত করিয়া উচ্চ স্তরে আনয়ন করা। যে দেশের গণ-শ্রেণী, শোষিত, লুণ্ঠিত ও পদদলিত হয় সেই দেশের জাতীয় মুক্তিরও সুবিধা হয় না। অন্যান্য দেশের ইতিহাস পাঠে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, জাতীয় মুক্তি প্রয়াসীর দল সেই দেশের গণশ্রেণীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাদের সহিত একীভূত হইয়া উদ্দেশ্য সফল করিয়াছে। বস্তুতঃ, কোন দেশেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির দল জাতীয় মুক্তি সাধন করিতে পারে নাই। এইজন্য গণশ্রেণীর সহিত কার্য্য করিয়া তাহাদের সহিত একীভূত হইয়া জাতীয় মুক্তির চেষ্টা আমাদের দেশে অনিবার্য্য। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থে অন্ধ হইয়া এই সত্য এখনও বুঝিতেছেন না বলিয়াই এত বহ্বাড়ম্বে লঘুক্রিয়া হইতেছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের কর্ণধার হইতেছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। অবশ্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থলেই এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের দেশের অবস্থার প্রভেদ আছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে পাঠ করি, ভাবুকের দল সমাজের কর্ণধার হন। ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখি, প্রত্যেক আন্দোলনের শীর্ষস্থানে একজন গভীর ভাবুক বিরাজ করেন যিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের সাহায্যে

তাঁহার মতকে বাস্তবকার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। তৎপর প্রত্যেক দলে ভাবুক সভ্যবৃন্দ আছেন যাঁহারা দলের মস্তিষ্ক-স্বরূপ কার্য্য করেন। বস্তুতঃ, তাঁহারাই দলের অধিনায়ক; বক্তার দল ও দলের কর্ম্মচারীরা নেতা হইতে পারেন না! প্রকৃত পক্ষে, মৌলিক চিন্তাশীল ও ভাবুক ব্যক্তিরাই সমাজ ও জাতীয় জীবন পরিচালনা কার্য্যের উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে জাতীয় জীবন কতকগুলি উকিল ও ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতি তাঁহাদের শ্রেণীগত ভাবের গণ্ডীর বাহিরে যায় না; এইজন্যই দেশ বা দশ অর্থে নিজেদেরই গণ্য করেন! সত্য বটে, এই শ্রেণীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক ও ত্যাগী আছেন কিন্তু সমাজকে নূতন ভাবে গঠন করিবার জন্য বা জাতীয় জীবনকে সংগঠন করিবার জন্য যে প্রখর চিন্তাশীলতা ও মৌলিক ভাবুকতার প্রয়োজন তাহা কোথায়? সে যুগপ্রবর্ত্তক কোথায়? পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে দৃষ্ট হয়, উকিল, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারেরা কোন পরাধীন জাতির একজাতীয়তা গঠনকালে নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। সমাজের বিবর্ত্তনের এই যুগে চাই মৌলিক ভাবুক আর চাই বীর্য্যবান, উদার হৃদয়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্ম্মী। ইহাদের স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দশের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হইবে. ইহার অর্থে, ইঁহাদের নিজেদের বংশগত অভিমান ও তজ্জনিত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দরিদ্র্যগণবৃন্দের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের উদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োজিত করিতে হইবে।

জাতি-সংগঠন

আজ বঙ্গদেশের স্বরাজলাভের আন্দোলনে ভাঁটা পড়িয়াছে। আজ পূর্ব্বেকার মতন উন্মাদনাও নাই, আর হুজুগও নাই। সকলেই বলিতেছেন, ইহার পর আবার কি ঢেউ আসিবে এবং ইহার জন্য, অনেকে অপেক্ষাও করিতেছেন; কিন্তু এই সত্য প্রণিধান করা উচিত যে "হুজুগ" বা ক্ষণিক উন্মাদনা জাতীয় মুক্তির সোপান বা উপায় নহে। ক্ষণিক হুজুগে লোকের মধ্যে উন্মত্ততা আনা যাইতে পারে বটে, কিন্তু, তাহাতে জাতীয় আদর্শ নিকটবর্ত্তী হয় না। জাতীয় জীবন সংগঠন চেষ্টায় জাতির হিতকর নানাপ্রকার চিরস্থায়ী কর্ম্মের প্রয়োজন। জাতীয় মুক্তি ও তদ্বারা এক-জাতীয়তা লাভের চেষ্টা-কালে আমাদের গঠনমূলক নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করিতে হইবে। কারণ, স্বরাজ ও স্বাধীনতা এমন কোনপ্রকারের খাদ্য দ্রব্য নহে যাহা অযাচিতভাবে বিনাক্লেশে লোকের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিবে। স্বরাজ কষ্টসাধ্য বস্তু। ইহাকে উপস্থিত নানা-বিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়া আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থাতে দেশের "বেশীর ভাগ লোকের" সঙ্গে কর্ম্ম করিবার কোন পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমাদের "দেশোদ্ধারের" কল্পনাজল্পনা শিক্ষিত শ্রেণীর ছেঁদো কথার বক্তৃতাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। অবশ্য আজকাল বহুজন হিতার্থে "গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির" কথা রাজনীতিক সমাজে প্রচারিত হইতেছে; এবং ইহাকে বাস্তব কর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য গ্রাম্য-সংস্কার প্রভৃতি কর্ম্মের আয়োজন হইতেছে। কিন্তু এস্থলে প্রণি

ধান করা উচিত "গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি" অর্থে আমরা কি বুঝি? কোনও গ্রামের পুষ্করিণী পরিষ্কার করা, রাস্তা পরিষ্কার করা, ব্যায়রাম নিবারণ করা, রোগীর সেবা করা প্রভৃতি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নোতির চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা লোকহিতকর কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণভাবে গঠনমূলক কর্ম্ম অর্থাৎ জাতীয়তা গঠনমূলক কর্ম্মে অভিহিত করা যাইতে পারে না। যথার্থ গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি সেইদিন লোক মধ্যে প্রচলিত হইবে সেই দিন আমরা নিজেদের জাতীয় ভাগ্য নিজ হস্তে পরিচালিত করিতে পারিব। জাতিমধ্যে নূতন আর্থনীতিক অবস্থার দ্বারা যে সব নূতন সামাজিক সমস্যার উদয় হয় ও পুরাতন পদ্ধতি বিপর্য্যস্ত প্রাপ্ত হয় তাহার পুনর্গঠন করা অথবা অধীনতাপাশে আবদ্ধ জাতিমধ্যে একজাতীয়তা আনয়নকল্পে আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যা সমূহের নিরাকরণ করিয়া জাতিকে নূতনভাবে গঠিত করাকে গঠনমূলক কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। একটি বিচ্ছিন্ন পদদলিত জাতিকে নূতন আর্থনীতিক ভিত্তির উপর উত্তোলিত করিয়া নূতন ভাবে গঠিত করা স্বাধীন অবস্থাতেই সম্ভব হয়, যথা নব্যরুষ, নব্যতুর্ক ও নব্যচীন করিতেছে। কিন্তু সেই কর্ম্মের পূর্ব্ব সূচনা তদগ্রেই আরম্ভ হইতে পারে। গঠনমূলক কর্ম্মের সমস্ত পদ্ধতি আমরা বর্ত্তমান সময়ে প্রযোজ্য করিতে হয়ত অক্ষম হইতে পারি কিন্তু জাতীয়তা গঠনের কতকাংশ আমরা উপস্থিত সময়ে কার্য্যকরী করিতে পারি।

এইস্থানে প্রশ্ন উঠে, ভারতে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিটি আসলে কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভারত একজাতীয়তা গঠনপ্রয়াসী। এই একজাতীয়ত্ব গঠনজন্য যে সব অনুষ্ঠান প্রয়োজন, সর্ব্ব নাগরিককে একীভূত করিয়া এক সভ্যতার মঞ্চে উপনীত করিবার জন্য ও জাতীয় চর্চ্চার ফলভোগী করিবার যে সব বিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাহার উদ্যোগকে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের ভারতে নূতন প্রকারের অর্থনীতি পদ্ধতির প্রচলনের জন্য সমাজের পুরাতন ভিত্তি বিপর্য্যস্ত হইতেছে, শনৈঃ শনৈঃ নূতন পদ্ধতির প্রচলন হইতেছে, সমাজের পুরাতন সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। এই সব কারণে নূতন প্রকারের সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যা-সমূহের উদয় হইতেছে। এই সব সমস্যার নিরাকরণই আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠনের কিয়দংশের কর্ম্ম। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে এই সব সমস্যার সমাধান হয়ত সম্ভব নয়, তত্রাচ জনসাধারণের মতকে তজ্জন্য প্রস্তুত করিতে যে সব বিষয়ের চর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন, যথা—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের আর্থ-নীতিক পদ্ধতি প্রচলিত বলিয়া এবং বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন অভি-ব্যক্তির স্তরে অবস্থিত বলিয়া সমস্যাগুলিও বিভিন্নাকারে বিরাজ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে—পূর্ব্ব ভারতে জমিদারী পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়া তথাকার জমীর সমস্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক; এবং জমীর মালীকত্ব ও ব্যব-হার করিবার বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত বলিয়া

সমস্যাও বিভিন্নভাবে উদয় হইয়াছে। তৎপরে বঙ্গে বর্ত্তমানকালের সভ্যতার বহুলপ্রচার হওয়াতে বর্ত্তমানযুগের আর্থনীতিক কারণ বশতঃ বাঙলায় পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় শ্রেণীবিভাগ উদয় হইয়াছে। এই প্রদেশে ভূস্বামীশ্রেণীর অভিজাত্যবর্গ, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও শ্রম-জীবি গণশ্রেণী, এই তিন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, এবং উপরিস্তন শ্রেণীসমূহে শ্রেণীস্বার্থজনিত শ্রেণীজ্ঞানও যথেষ্ট হইয়াছে। ইহারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষিত করিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকেন, কিন্তু, জমীর সমস্যা, গণশ্রেণীর প্রতি সামাজিক ও আর্থনীতিক ন্যায্যতা ও তাহাদের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর সম্বন্ধ, ভারতীয় ধন-সম্পত্তির উৎপত্তি ও বণ্টনস্থলসমূহের জাতীয় অধিকারীত্ব প্রভৃতি প্রশ্ন যাহা আধুনিক জগতে আন্দোলিত হইতেছে ভারতে সে প্রশ্নের আজ মিমাংসা না হইলেও শিক্ষিত লোকমধ্যে তাহার বিচারের প্রয়োজন। এইজন্য এই সব প্রশ্ন "ধামা চাপা" না দিয়া তাহার আন্দোলন করা প্রয়োজন। এই সব সমস্যা ধনীশ্রেণীর অপ্রিয় হইলেও ভবিষ্যতে "ভারতের বেশীর ভাগ লোকের" মঙ্গলকর বলিয়া সাধারণে তাহার উত্থাপন প্রয়োজন।

ধর্ম্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও ধনীশ্রেণীর স্বার্থ দ্বারা ভারতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হইবে না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি দোষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, আমরা নব জাতীয় জীবন সংগঠন জন্য প্রয়োজনীয় গভীর সমস্যাগুলিকে "ধামাচাপা" দিয়া ছেঁদোকথায় ফাঁকি দিয়া একজাতীয়তা আনয়ন করিতে চাই!

কিন্তু আমাদের বোধগম্য করা উচিত যে, ফাঁকির উপর কোন বস্তু গঠিত হইতে পারে না! আমরা বরাবরই ভাবের ঘরে চুরি করিতেছি, সেই জন্যই আমাদের জাতীয়তা গঠনের জন্য এ যাবতের সমস্ত চেষ্টা ধূলিসাৎ হইতেছে!

এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য জগতকে আমাদের নূতন-ভাবে দেখিতে হইবে; জগতের প্রতি আমাদের পূর্ব্ব ধারণা বদলাইতে হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে "ভারতবাসী" অর্থে মুষ্টিমের ধনীশ্রেণী ও শিক্ষিতমণ্ডলী নহে এবং জাতীয়তা অর্থে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ নহে! ভারতের গরীব গণবৃন্দই এদেশের বেশীর ভাগ লোক, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সভ্যতার উচ্চ-স্তরে উত্তোলিত করাই হইতেছে আমাদের গঠনমূলক কর্ম্ম এবং ইহাও বিশেষভাবে বোধগম্য করা উচিত যে, যতদিন ভারতের এই "বেশীরভাগ লোক" উত্তোলিত হইয়া শিক্ষিতমণ্ডলীর সহিত এক জাতীয়তা সূত্রে গ্রথিত না হইবে ততদিনও ভারতের জাতীয় মুক্তি সহজ হইবে না।

এই ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আমাদের গণশ্রেণীর সহিত কার্য্য করিতে হইবে। এই স্থলে কথা উঠে, এই কার্য্যে কে অগ্রসর হইবে? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই কাজ আমাদের শিক্ষিত যুবক-দেরই করণীয়। এই কার্য্যে, এতেচ্ছুক শিক্ষিত যুবকদের স্বীয় শ্রেণী ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সহিত একীভূত হইয়া তাহাদের উত্তোলিত করিতে হইবে। এই স্থলে

বিচার্য্য তাহাদের মধ্যে, কি কি কর্ম্ম করা প্রয়োজন ও উপস্থিত সময়ে সম্ভবপর ?

সংঘবদ্ধতা শক্তির পরিচায়ক। যে লোকসমষ্টি সংঘবদ্ধ না হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণে সময়ক্ষেপ করে, তাহার ইহজগতে ভীষণ জীবনসংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকা সম্ভব নহে। সমবায় সাহায্য ও সংঘবদ্ধতা দ্বারাই বিভিন্ন জীবসমষ্টি ইহজগতে বাঁচিয়া আছে। মানবসমাজেও এই জীবতত্ত্বীক বিধান সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয়েরা বর্ত্তমানযুগের বর্ত্তমান প্রণালীতে সংঘবদ্ধ নহে বলিয়াই তাহাদের এত দৌর্ব্বল্য ! এই স্থলে গঠনমূলক কর্ম্মের প্রথম সোপান নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করিয়া বিবৃত হইল :—প্রথমতঃ, ভারতীয় গণশ্রেণীকে আর্থনীতিক ভিত্তির উপর সংঘবদ্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ, আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকারের সমবায় পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে প্রচলন করা, তৃতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা। চতুর্থতঃ, তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সেবাব্রত প্রচলন করা। এই সব প্রকারে যখন তাহারা সংঘবদ্ধ হইবে ও শিক্ষিত হইবে সেই অবস্থায় তাহারা স্বরাজসাধনের উৎকৃষ্ট আধার-রূপে রূপান্তরিত হইবে এবং তদ্দ্বারা স্বরাজের রাস্তাও নিকটবর্ত্তী হইবে।

উপস্থিত স্থলে, উপরোক্ত গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির বিশদভাবে আলোচনা না করিয়া আমাদের এইটুকু জানিতে হইবে যে,

ভারতের বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী গণবৃন্দকে প্যাক্ট বা বিভিন্ন জোড়া তাড়া দ্বারা মৈত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। এই চেষ্টা প্রতি-বারেই বিফলকাম হইয়াছে। "সাম্প্রদায়িক" কলহ শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্য হইতেই উত্থিত হয়। ইহা "ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যানুসারে" শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত। মূর্খ, দরিদ্র গণসমূহ শিক্ষিতদের কলহের ফলস্বরূপ লাভালাভের অংশীদার হয় না। তাহারা মূর্খতা বশতঃ শিক্ষিতলোক ও পৌরহিত্যবর্গের স্বার্থপ্রণোদিত চেষ্টার বশীভূত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ধর্ম্মান্ধতা প্রদর্শন করে। তাহাদের এবম্প্রকারের মানসিক অবস্থা অপনোদনের নিমিত্ত তাহা-দের স্বার্থান্বেষী বাবু ও পৌরোহিত্য আধিপত্য হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজন। এইজন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গণ-শ্রেণীর পারস্পারিক আর্থনীতিক সম্বন্ধ ভাল করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে। ভারতীয় গণসমূহ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের ঐক্যতা দর্শন করাইয়া তাহাদের একসংঘাধীন করিতে হইবে। গণসমূহ অর্থে, যাহারা কৃষিজীবি ও যাহারা শ্রমজীবী—তাহাদের বুঝায়। কিন্তু ভারতে এই সঙ্গে ক্ষুদ্র কর্ম্মজীবী ও ক্ষুদ্র চাকরিজীবীদেরও গণ্য করিতে হইবে। এই সর্ব্বপ্রকারের লোকদের লইয়া গণ-শ্রেণীর আন্দোলনকল্পে "শ্রমিক সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কি প্রকারে "শ্রমিক সঙ্ঘ" সংগঠিত করিতে হইবে ও তাহার আইন পদ্ধতি প্রভৃতি কিরূপ হইবে তাহা এস্থলে অবান্তর বলিয়া আলোচিত হইল না। তবে শ্রমজীবী আন্দোলন, শ্রমিকদের শ্রমোপযোগী

উচিৎ বেতন, কর্ম্ম করিবার 'সময়' অপেক্ষাকৃত হ্রাস করা, মনিবের নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পাওয়া, জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষা, জীবনবীমা, আর্থনীতিক ন্যায্যতা, জমীর নূতন ব্যবস্থা, রাইয়তের অভাব ও অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিবে। এই আন্দোলনকল্পে গণশ্রেণীর লোকদের এক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধতার উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইজন্য বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তক সম্বলিত পাঠাগার স্থাপিত করিতে হইবে; বক্তৃতাদি দিতে হইবে; এই আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তক সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশিত করিতে হইবে। কিন্তু, গণশ্রেণীর মধ্যে কর্ম্মেচ্ছুক কর্ম্মীদের সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন কর্ম্মের দর্শনশাস্ত্র ও কর্ম্মপদ্ধতি, স্বাস্থ্য ও সেবাতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত তাহাদের শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও তৎসঙ্গে নবোভাবের পুস্তক সমূহ স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত করা প্রয়োজন।

এই প্রকারে নবভাবে শিক্ষিত কর্ম্মীকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে স্থানীয় লোকদের লইয়া সংঘের প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। স্থানীয় কেন্দ্রগুলি মিলিত হইয়া জেলা প্রতিষ্ঠানে বা সমিতিতে পরিণত হইবে, এবং জেলা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হইবে। ইহা ব্যতীত, কর্ম্ম-

বিভাগজনিত বিভিন্ন প্রকারের নিখিলভারতীয় শ্রমিক সংঘগুলি একটি নিখিলভারতীয় সংঘে কেন্দ্রীভূত হইয়া ভারতের শ্রমজীবী-শ্রেণীর সমস্ত সংঘবদ্ধ সভ্যদের এক কেন্দ্র হইতে এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিবে। এবং সংঘবদ্ধতা দ্বারা "ভারতের বেশীরভাগ লোক" ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সাম্প্রদায়িকতার উপর উত্থিত হইয়া এক জাতীয়তা সংগঠনের প্রথম সোপান প্রস্তুত করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, দারিদ্র্যপীড়িত ভারতের বেশীরভাগ লোকের আর্থনীতিক উন্নতিকল্পে বহুপ্রকারের সমবায় আন্দোলন প্রচারিত করা উচিৎ। অভূক্ত দরিদ্রব্যক্তিরা কখনও রাজনীতিক মুক্তির মন্ত্র-স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে না। হৃষ্টপুষ্ট স্বচ্ছলাবস্থার জনবৃন্দ বরং উপরোক্ত কর্ম্মের সহায়ক হইতে সমর্থ হয়। এই জন্য একদিকে যে প্রকারে আমাদের দরিদ্র গণবৃন্দের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সংঘ-বদ্ধ করিতে হইবে, অন্যদিকে তাহাদের ধনবৃদ্ধির উপায়স্বরূপ সমবায় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইস্থলে ইহাও উল্লেখ্য, বঙ্গ প্রদেশে গণশ্রেণীর ন্যায় মধ্যবিত্তশ্রেণীও দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে ক্লেশ পাইতেছে। এই শ্রেণীর বেকার লোকেরা সমবায় পদ্ধতি অব-লম্বন করিয়া নিজেদের অর্থসমস্যা দূর করিতে পারেন, অথবা তাহারা গণশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশময় বিভিন্ন প্রকারের সমবায় পদ্ধতি অনুসারে অর্থোপার্জ্জনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিলে উভয়েরই উপকার হইতে পারে।

এই ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বোঝা দরকার যে, আমাদের দরিদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণী ও শ্রমজীবীশ্রেণী উভয়কে একত্রিত হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এই স্থলে সমবায় পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকার ও তাহার পদ্ধতি এবং আইন কানুনের বিচার না করিয়া ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমবায় পদ্ধতি দ্বারা নির্ধনশ্রেণী উপকৃত হইতেছে এবং এদেশেও তাহা সফল হইবে। আর ভারতের যে সব স্থানে যে প্রকারের সমবায় পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে তাহা দ্বারা গরীবদের উপকারই হইতেছে।

এক্ষণে, নির্ধনশ্রেণীসমূহের আর্থিক উন্নতির জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রকারের সমবায় পদ্ধতি প্রচলিত করা আশু কর্ত্তব্য এবং বেকার শিক্ষিত যুবকেরা এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন কল্পে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, নিরক্ষর অজ্ঞ-গণশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইবার জন্য শিক্ষিত যুবকদের প্রত্যেক গ্রামে দৈনিক বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়াদি বিদ্যার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে, এবং যে সব ব্যক্তি বিভিন্ন কারণ বশতঃ বিদ্যালয়ে আসিতে অক্ষম, তাহাদের শিক্ষার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন, বক্তৃতা, মেলা প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞান সঞ্চার করাইতে হইবে। ফলতঃ, অজ্ঞ লোকেদের মধ্যে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় যত প্রকারে সম্ভব হয় প্রচার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, যুবক কর্ম্মীদের নির্ধন, নিঃসহায় ও অজ্ঞ লোকগণ মধ্যে সেবাব্রত অবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, দৈনিক

জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। এই জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন, বক্তৃতাদি দ্বারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও উচ্চতর সামাজিক ও আর্থনীতিকতত্ত্ব লোক মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। শেষে এই সব কর্ম্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন। গণশ্রেণীর আন্দোলনকল্পে ধনীশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, যদিচ, অনেক উদারচেতা ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্ত হইতে পারেন। এই কর্ম্মের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ আমাদের জনসাধারণের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে হইবে এই নিমিত্ত সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য একটি কমিটি স্থাপনের প্রয়োজন।

উপরোক্ত গুটিকতক কথাতে ভারতের বেশীর ভাগ লোকবৃন্দকে সংঘবদ্ধ ও উন্নত জীবনে আনয়ন করিবার যৎকিঞ্চিৎ উপায় বিবৃত হইল। এই উপায় বলিতে যত সোজা, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা প্রতীত হইবে না। কর্ম্মীদের প্রতিপদে ধনীশ্রেণীর রোষ ও তদ্বারা বিঘ্ন উৎপাদন ভোগ করিতে হইবে, মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট এই সব কর্ম্ম উপেক্ষিত হইবে ; কর্ম্মীদের নানাপদে লাঞ্ছিত ও নির্য্যা-তীত হইতে হইবে ; কিন্তু তত্রাচ যাহারা ভারতবাসীর মুক্তির জন্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা ভারতকে সভ্যতার উন্নতিতর শিখরে আরোহিত হইতে দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা ভারতের বেশীর ভাগ লোকসমূহকে অপেক্ষাকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের গণশ্রেণীর মুক্তি ও উন্নতির কর্ম্মে আত্মনিয়োজিত করা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।

জাতি-সংগঠন

আজ চাই শ্রেণীস্বার্থ-শূন্য শিক্ষিত যুবকদের দল, যাঁহারা স্বদেশের মুক্তিকামী হইয়া উপরোক্ত প্রকারের কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া গণসাধারণ মধ্যে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইবেন। বর্ত্তমানে ইহাই হইতেছে আমাদের "গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির" প্রথমাংশ। ভারতে স্বাধীন জাতীয় জীবন সংগঠন ও একজাতীয়তা প্রাপ্ত হইবার অন্য প্রথম সোপান আর নাই।

তরুণের কর্ত্তব্য

এই বৎসর বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় যুবকবৃন্দ যুবক সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন। সাধারণে প্রশ্ন করেন যে, ইহার উপকারিতা কি? এবম্প্রকারের সম্মেলনের সফলতা একদিনে দৃষ্ট হয় না কিন্তু এই প্রকারেই একটা আন্দোলনের সূচনা হয়! কোন একটা আন্দোলনের পূর্ণ আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয় না বটে, কিন্তু চেষ্টার কিয়দংশ সফলতা লাভ করে এবং পরবর্ত্তী আন্দোলন তাহারই উপর ভিত্তি স্থাপন করে। আন্দোলনের তরঙ্গ উপর্য্যুপরি আসিয়া জনসাধারণকে গন্তব্য স্থলাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই আমরা চাই, বাঙ্গালার সমস্ত জেলার যুবকেরা বাৎসরিক সম্মিলনীতে সম্মিলিত হউক, দেশের যুবকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাউক এবং এই প্রকারে সমগ্র ভারতের যুবকশ্রেণী এক নূতন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, নূতন প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া নূতন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া দশের সেবায় ব্যাপৃত হউক।

জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, সর্ব্বদেশের জাতীয় জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার কার্য্যে শিক্ষিত যুবকেরাই অগ্রসর হয়; তাঁহাদের যৌবনের উৎসাহ, সাহস, উদ্দীপনা ও বিদ্যা জাতিকে নূতন পথে পরিচালিত করে। তাঁহারা নূতনভাবে ও নূতনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় জীবনের দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল বিঘ্নসমূহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আদর্শ-স্থলে উপনীত হন। আর প্রৌঢ়েরা ও বৃদ্ধেরা তাহা দর্শন করিয়া

ভীত হইয়া গালে হাত দিয়া বলেন, "কি সর্ব্বনাশ করিতেছে" ! যুবকেরাই মানব-সমাজকে অগ্রগামী করিয়া দেয়। আমেরিকায়, টমাস জেফারসন নামক অষ্টবিংশ বর্ষীয় এক যুবকের লেখনী হইতেই জগতের চিরস্মরণীয় মানব-ইতিহাসের এক নূতন দলিল "Declaration of the rights of man" নিসৃত হইয়াছিল। ইঁহারই এই লেখনী হইতে বর্ত্তমান জগতের নূতন আশাময়ী বাণী যে, "all men are born free and euqal" (সকল মানব মুক্ত ও সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে) বহির্গত হইয়াছিল ! কিন্তু বিদেশের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না করিয়া স্বগৃহের কথা কহি যে, বিগত চারিশত বৎসরে সহস্র বন্ধনের আশীবিষে জর্জ্জরিত, ভীরু অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতির যুবকেরাই অনেক বার নানাপ্রকারের মুক্তি-আন্দোলন চালাইয়াছেন। এই প্রদেশেরই এক মহাপণ্ডিত যুবক নিমাই মানবের সাম্যতা প্রচার করিয়া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; এই প্রদেশেরই রাজা উপাধিধারী দুই মহাধনীর একমাত্র সন্তান নরোত্তম দাস ও রঘুনাথ দাস সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আচণ্ডালে প্রেমপ্রচার করিয়াছিলেন ; এই প্রদেশেরই তরুণেরা নূতন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের সংকীর্ণতা ভগ্ন করিয়া "নব বাঙ্গালার" ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন ; এই প্রদেশেরই একজন যুবক কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম ও সমাজে বিপ্লব সাধন করিয়া সমগ্র ভারতে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন; এবং তদ্বারা বর্ত্তমান ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রদেশেই বর্ত্তমান যুগে যুবকেরা নব বাঙ্গালার বহুমুখী কর্ম্ম-

ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই প্রদেশের অনেক তরুণই, কবির কথায় বলিতে হইলে

"(লক্ষ) পরাণে শঙ্কা না মানে
না রাখে কাহার ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন" !

হইয়া স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন ও কারাগার বরণ করিয়াছেন ! এইজন্য যুবকশক্তিকে অগ্রাহ্য না করিয়া যাহাতে সেই শক্তি নূতনালোক প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় জীবন সংগঠন কর্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমান জগতে চীন, তুর্কি, রুষ, পারস্য প্রভৃতি দেশের শিক্ষিত যুবকেরাই তাহাদের জাতিকে নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। আর ভারতের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় কি সে বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন ? বাঙ্গালার শিক্ষিত তরুণেরা জগতে অনেক কর্ম্মই করিয়াছেন, অনেক অসাধ্য কর্ম্মই তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, এমন কর্ম্ম নাই যাহা তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইলে যে বিকাশ লাভ করিবে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশসমূহের যুবকশ্রেণীর কার্য্যকলাপের ইতিহাসের সহিত সমানভাবে তুলনা হইতে পারিবে। আজ পর্য্যন্ত তরুণ বাঙ্গালা

নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যাহা করিয়াছে তাহাই অন্যদেশের যুবক-শ্রেণীর কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে তুল্যাখ্যা প্রাপ্ত হইবে!

বাঙ্গালার তরুণের অন্তর্নিহিত জাতীয় কার্য্যকরী শক্তিকে (race capacity) উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সেই শক্তিকে জাতীয় জীবনের নানা বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে অগ্রগামী করিতে হইবে। বাঙ্গালার তরুণের সম্মুখে অতি বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে আর গৃহে কূপমণ্ডুকের ন্যায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এক্ষণে নিষ্ক্রিয়তা ও অবসাদের জের ক্রমে ক্রমে আমাদের মন হইতে অপসারিত হইতেছে। নূতনের দিকে মন ধাবিত হইতেছে। কিন্তু নূতনটি কি তাহা এক্ষণে কেহ ধরিতে পারিতেছেন না।

অনেকে বলেন, বাঙ্গালার তরুণেরা অব্যবস্থিতচিত্ত, হুজুগপ্রিয়। সেদিন যাহা তাঁহারা "নূতন" বলিয়া ধরিয়াছিলেন আজ তাহা পুরাতন হইয়াছে বলিয়া আর কিছু নূতন শুনিয়া হুজুগ করিতে চান! চিন্তাশক্তি ও বিবেককে তাঁহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চান না; কেবল গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান হইয়া হৈ চৈ করিতে চান! কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী কে বা কাহারা?

রাজনীতিক্ষেত্রে, থিয়েটারি অভিনয়, পুতুলবাজীর নাচ ও ভোজবাজীর খেলাকে কর্ম্মপদ্ধতি বলিয়া দেশের কর্ত্তারা সাধারণের সম্মুখে ক্রমাগত ধরিতেছেন, এবং তরুণেরাও সেই ভানুমতীর ভোজবাজীর বাদ্যের তালের সহিত নৃত্য করিতেছেন বলিয়া আজ তাঁহারা এত দিশেহারা ও হুজুগপ্রিয় হইয়াছেন। বিগত চল্লিশ

বৎসর ধরিয়া আমাদের সাধারণ জীবনে এক অদ্ভুত রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সভাসমিতির কার্য্যে থিয়েটারি ভাবটা আনা হইয়াছে! জনমত সৃষ্ট করিবার জন্য সভ্যদেশসমূহে সভা আহ্বান করা হয়; অন্য সব দেশে দেখিয়াছি, সাধারণ বক্তৃতা সভাতে তরুণদের উপস্থিতি অতি বিরল! প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরাই সেই সব বক্তৃতাগৃহে গমন করেন; আর তরুণেরা খেলাধূলা, থিয়েটার বা তাঁহাদের সঙ্গিনীদের লইয়া সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু, এদেশে সভা সমিতিতে তরুণেরাই গমন করেন। প্রৌঢ়েরা হয় গভর্ণমেণ্ট চাকরিজীবী বলিয়া এইসব স্থান হইতে দূরে থাকেন, না হয়, অন্য কারণে বক্তৃতা বিষয়ে উদাসীন হন ও "জাতি মারামারির" কার্য্যে কালক্ষেপ করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটান; আর বৃদ্ধেরা এদেশে শয্যাই প্রশস্ত ব্যবস্থা বলিয়া ঘরের বাহির হন না! কাযেই সর্ব্ব বক্তৃতাসভা বেশীর ভাগ তরুণদের দ্বারাই মণ্ডিত হয়; কিন্তু মানবের মন সর্ব্বদেশেই এক অবস্থায় একভাবে কার্য্য করে। যাঁহারা বলেন, "ভারতবর্ষ একটা অদ্ভুত দেশ" তাঁহাদের এই অদ্ভুত উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমি ভারতীয় তরুণদের এই রীতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। আমাদের দেশের তরুণদের সান্ধ্য সমীরণ সেবনের জন্য রাস্তায় বহির্গত হইয়া কোন এক বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করা বা সন্ধ্যাকালে কোথাও সময়টা বিনা খরচায় মজায় কাটাইতে হইবে বলিয়া অমুকের "লেকচার" শুনিতে যাওয়া ব্যাপারটি, প্রতীচ্য দেশীয় তরুণদের বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে

খেলা, কিনো বা কন্‌সার্টে সঙ্গিনীদের সহিত গমন অথবা cafe chanttent বা Brulesqueএ অভিনেত্রীদের অঙ্গভঙ্গীর অভিনয় শ্রবণ করার উদ্দেশ্য উভয়পক্ষেরই এক (homologue) ! আমার কথাটা শক্ত বলা হইল বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু মনস্তত্ত্বীক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, উভয় কর্ম্মের কার্য্যকারীতা (Function) একই !

প্রতীচ্য যুবক দৈনন্দীন জীবনের কর্ম্ম করিয়া একটু স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য কাফে বা কিনো বা কন্‌সার্টে গমন করে। তথায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া ও গান শ্রবণ করিয়া মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া তাহার Sub-conscious mindএ যে প্রকারে ভাবের উদয় হয় অর্থাৎ মনকে দৈনিক কার্য্য হইতে অবসর দিবার জন্য অন্য প্রকারের উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজনীয়তা যেরূপ আছে এবং তজ্জন্য লোকে নানাপ্রকার ভাঁড়ামী বা উত্তেজনা খুঁজে, আমাদের দেশেও অনেক যুবকের কাছে"লেকচার"শুনা কার্য্যটা সেই প্রকারের কার্য্য করে। বক্তৃতামঞ্চকে যদি বক্তা রঙ্গমঞ্চে পরিণত করিতে না পারেন এবং নিজে হয় ভাঁড়ামী করিয়া না হয় নানা প্রকারের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় তরুণদের মস্তিষ্ক গরম করিয়া Subconscious mind-এ একটা উত্তেজনার ভাব না আনিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতা সফল হইল না। তিনি Orator বলিয়া national calenderএ গণ্য হইলেন না, এবং তাঁহার "নেতা" হইবার আশায় জলাঞ্জলি

দিতে হইবে। কথা এই, আমাদের তরুণদের সন্ধ্যাবেলায় একটা diversion চাই অর্থাৎ মনটাকে দৈনন্দীন কার্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। এদেশে সামাজিক প্রথা প্রতীচ্য দেশের ন্যায় নহে বলিয়া, অন্য ব্যবস্থা হয়। তরুণের পয়সা থাকিলে সে কিনো বা থিয়েটারে গিয়া recreation গ্রহণ করিবে, না হয় বিনা পয়সায় লেকচার হলে গিয়া সেই diversion খুঁজিবে! সে বক্তার হাব-ভাব, অঙ্গভঙ্গী, নাচন কোঁদন দেখিয়া থিয়েটারের "encore" হাত-তালী দেওয়ার ন্যায় ঘন ঘন করতালী দিবে এবং তদ্বারা নিজের মনেও একটা স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। ইহা যদি না হয় তাহা হইলে তরুণের কাছে সেই বক্তৃতা বাজে; বক্তা কোন কাজের নয় এবং এবং নেতাগিরি পেষাবলম্বন করিতে অযোগ্য!

আমাদের দেশে সাধারণের জন্য যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহাতে sentiment-এর শ্রাদ্ধ করা হয়! কেবল ভাবপ্রবণতা ও ভাবের উদ্দীপনা করিয়া বক্তার হাততালী পাইবার চেষ্টা করাই হইতেছে ফ্যাসান। শ্রোতাদের মস্তিষ্কে নূতন ভাব প্রবেশ করা-ইয়া তাহাদের চিন্তার খাদ্য জোগান হয় না। কেবল ভাব প্রবণতার ফোয়ারা খোলা হয় বলিয়াই আমাদের একটা চিন্তাশীল public opinion (জনমত) গঠিত হইতে পারে নাই। এই কারণেই কোন চিন্তাশীল বা বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাতে শ্রোতার অভাব হয় কিন্তু সন্ধ্যাবেলাটা আমোদে কাটাইবার জন্য মেটো বক্তৃতাতে শ্রোতার অভাব হয় না।

ইহার ফল কি হইয়াছে ? দেশে একটা চিন্তাশীল জনসাধারণ গঠিত হয় নাই, সেই জন্ত দেশেও একটা শিক্ষিত জনমত নাই ! আমাদের দেশে জনসাধারণ অর্থে ছাত্রবৃন্দ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাদের মত পদ্মপত্রের জলের ন্যায় ক্রমাগতই ওই রঙ্গমঞ্চের থিয়েটারী নাচন কাঁদনের উপর নির্ভর করিয়া টলে !

ইহার ফল দেশের পক্ষে বিশেষ বিষময় হইয়াছে এবং ছাত্র বৃন্দেরও ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়। তাঁহারা চিন্তাশীল হইতে শিক্ষা করিতেছেন না, হুজুগপ্রিয় হইতেছেন। এইস্থলে আমার অভিজ্ঞ-তার দ্বারা সাক্ষ্য দিতে পারি যে, ইউরোপে ও আমেরিকায় উচ্চৈঃ-স্বরে চেঁচাইয়া বক্তৃতা করা বা ভাঁড়ামী করাকে বক্তার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় না ! সে সব দেশে মেছো-হাটায় শ্রমিক বক্তারা চেঁচামেচি দ্বারা বক্তৃতা করিয়া লোক ক্ষেপান বটে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজের প্রথা অন্ত প্রকার।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা শিক্ষিত যুবকদের নিকট কি চাই ? আমরা চাই, আমাদের যুবকেরা চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতির হউন, ও বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করুন। একটা জাতির মধ্যে ভাবপ্রবণতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে মৌলিক চিন্তা থাকাও দরকার। আমাদের জাতীয় জীবনে কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস দ্বারা কর্ম্ম করিতে যাই বলিয়া সমস্তই ক্ষণিক উত্তেজনাতে পর্য্যবসিত হইতেছে।

কেবল উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা ও হুজুগে জাতীয় জীবন সংগঠিত

হয় না এবং জাতীয় স্বাধীনতাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের চাই গঠনমূলক কার্য্য। বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিতে হইবে; দেশের জনবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে! তবে আমরা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারিব। কিন্তু এই সব কার্য্যের উদ্যোগী হইবে কাহারা? শিক্ষিত যুবকদেরই এই কার্য্য করিতে হইবে। জাতীয় স্বাধীনতা ব্রতের কার্য্য গ্রহণ করিবার অগ্রে কিন্তু আমাদের পন্থার কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন সমাধান করিতে হইবে। কি চাই, কেন চাই, কাহার জন্য চাই, তাহার জন্য কি উপায় গ্রহণ করিতে হইবে—এই সব প্রশ্নের মীমাংসা প্রথম করিতে হইবে। যদি আমরা এখনও ভাবি, একটা হৈ চৈ করিয়া চেঁচাইয়া গোলে হরিবোল দিলে, অভাবনীয় অত্যল্প সময়ে ভারত স্বাধীন হইবে, তাহা হইলে আমরা আজও অভিজ্ঞতার ফললাভ করি নাই, আমরা এখনও অজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছি! স্বদেশের কর্ম্মের অভিজ্ঞতা ও বিদেশের সেই প্রকারের কার্য্যের অভিজ্ঞতা তুলনা করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের গতি নিরূপিত করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত আমরা বিদেশীয় অভিজ্ঞতার ফল গ্রহণ করিতেছি না, কারণ একটা নূতন বুলি উঠিয়াছে "ভারত একটি অদ্ভুত দেশ" অতএব একটা সৃষ্টি ছাড়া উপায়ে ইহার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে! কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ এই "সৃষ্টিছাড়া" উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, যদিচ ১৯০১ খ্রীঃ হইতে অরবিন্দের বরোদার দল থেকে আজকের নেতাদের আমল পর্য্যন্ত দেশোদ্ধারের

উপায় স্বরূপ অনেক আজগুবি ও অলৌকিক গল্প শ্রবণ করিয়া আসিতেছি !

আমাদের তরুণদের পুরাতন আদর্শ, পুরাতন চিন্তা (যদি কিছু থাকে), পুরাতনপন্থা ত্যাগ করিয়া নূতনাভিমুখে গমন করিতে হইবে। যে জাতি কেবল পশ্চাৎভাগে নিরীক্ষণ করে সে জাতি কখন সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। আজ আমাদের অগ্রে চলিতে হইবে। যে সব জাতিকে পূর্ব্বে আমরা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঘৃণা করিয়াছিলাম, সেই সব জাতিও অগ্রে চলিতেছে, আর আমরা এখনও "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" আছি।

নূতনের দিকে চলিবার জন্য, নূতনালোক প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের নূতন world view চাই অর্থাৎ জগতের প্রতি আমাদের নূতন ধারণা করিতে হইবে। সমাজকে নূতন চক্ষে দেখিতে হইবে, ইতিহাসকে নূতনালোকে পাঠ করিতে হইবে। আর চাই, নূতন উদ্দীপনা সমূহের (stimuli) প্রতি প্রতিক্রিয়াশালী হওয়া।

নূতন **world view**কে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমাদের একটা নূতন দর্শনশাস্ত্র গঠন করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের রাজনীতির কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, সমাজতত্ত্ব এখনও অজ্ঞাত-বিজ্ঞান, অর্থনীতি-বিজ্ঞানকে জাতীয় কার্য্যে প্রয়োগ করিবার কালে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করি ! এবং অর্থনীতি-বিজ্ঞানের যে টুকুকে জাতীয় ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া "ভারতীয়" বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করি সেটুকুই আবার ইউরোপের পুরাতন ও পরিত্যজ্য মাল !

এই সব জন্য বলি, চাই আমাদের মৌলিক গবেষণা, চাই জাতীয় কার্য্যে প্রখর চিন্তাশীলতা। তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কশালী ব্যক্তিদের জাতীয় জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে!

প্রতীচ্য দেশ সমূহে দৃষ্ট হয়, কোন একটা জাতীয় ভাঙ্গাগড়ার, কার্য্যে একজন মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি একটি দর্শনশাস্ত্র গড়েন, তাঁহার শিষ্যেরা তাহাকে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার কিছুই নাই। আমরা অবগত নহি যে, প্রতীচ্য দেশে "জাতীয় স্বাধীনতার কার্য্যকে"ও বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপিত করা হইয়াছে। লেলিন "বৈপ্লবিক কার্য্যকে"ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্যে আনিয়াছেন! আমাদেরও জাতীয় জীবন সংগঠন কার্য্যকে বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত করিতে হইবে। হুজুগ ও হৈ চৈ তে আর জাতীয় জীবন সংগঠন করা চলে না।

বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া আমরা বলিতেছি "স্বরাজ" চাই। ইহা লইয়া অনেক হুজুগই হইতেছে। কিন্তু সেই স্বরাজটির স্বরূপ কি তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল না! শুনিয়াছি, এই বঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেশ পার্টির এক বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় স্বরাজের স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আর একজন জননায়ক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Swaraj is swaraj" অর্থাৎ স্বরাজ অর্থে স্বরাজ; ইহার আবার ব্যাখ্যা কি? কিন্তু এবম্প্রকারের উক্তি রাজনীতি বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। দেশের জন সাধারণকে বলিতেছি—স্বরাজের জন্য সর্ব্বস্ব--যায় জীবন

পর্য্যন্ত দান কর,কিন্তু স্বরাজ কি“অশ্বডিম্ব” বা “সোণার পাথর বাটি” তাহা কেহ বোধগম্য করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া দেশের অশিক্ষিত গণবৃন্দের ধর্ম্মান্ধতা ক্ষিপ্ত করা হইল, বলা হইল তাহারা খিলাফত ও স্বরাজের জন্য মরুক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিলেন না, যদিচ আজ অনেক হিন্দু রক্তাক্ত কলেবর হইয়া রক্তের অশ্রু ফেলিয়া তাহা বুঝিতেছেন !

এই প্রকার অবস্থা দেশে হয় কেন ? প্রথমতঃ, ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ গায়ে আঁচড় না লাগাইয়া একটা হৈ চৈ করিয়া দেশোদ্ধার হয় ভালই, না হয়, নিজেকে ফাঁক তালে “বড়” করার সুযোগ হয় ! দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ব্যাপারের বিচার করিয়া কার্য্য করিতে যাইলে অনেক বিপদ; Vested interest”এর ক্ষতি হয় ! শ্রেণী বা সমষ্টির স্বার্থত্যাগ করিব না ; সর্ব্ববিষয়ে ধামা চাপা দিয়া লোক ক্ষেপাইয়া গোলে হরিবোল দিয়া যদি স্বাধীনতা ও স্বরাজ আসে তাহা হইলে “বহুত আচ্ছা”, আর এই মূর্খ-প্রধান দেশে আমার দলই রাজত্ব শাসন করিবে ইহাত বাঁধা কথা ! ইহাই হইতেছে শিক্ষিতদের মনস্তত্ত্ব। এই জন্যই সব কথা ধামা চাপা রাখা হয়, এবং বুলি বাহির হইয়াছে “India is a peculiar Country ergo, it demands a peculiar solution”। আর যদি কেহ বিচার করিয়া এই সমস্ত কথার মিমাংসা করিতে চান তাহা হইলেই vested interest চীৎকার করিয়া

উঠেন, "radical", "subversive', ! কিন্তু বলি, হে সনাতন পন্থী, হে দেশভক্ত, হে ভারতধর্ম্মী ও প্রাচীনত্বের ধ্বজাধারী, ভারত একটা অদ্ভুত দেশ বলিয়া দেশ স্বাধীন করিবার অদ্ভুত মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা এতদিন করিয়াছ তাহাতে দেশ কি স্বাধীন হইল? বরং ইউরোপের পরিত্যজ্য প্রণালী ও ভাব সমূহকে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে (ভারতীয় সনাতনপ্রথা) বলিয়া চালাইতেছে, কিন্তু ভবিষ্যতই ইহার হিসাব নিকাশ করিবে!

'স্বরাজ' অর্থে 'স্বরাজ' নহে; এবং খিলাফৎ ও জেজিরৎ-উল আরবের জন্য ভারতীয় গণবৃন্দ প্রাণ দান করিবে না, অন্ততঃ, বিগত জগতব্যাপী যুদ্ধের সময় যখন ইসলামের খলিফা খেলাফৎকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন তৎকালে ভারতীয় মুসলমানেরা সে আহ্বানে সাড়া দেন নাই। ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যাই (Economic interpretation of history) তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে প্রবল বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল! মধ্যযুগের প্রথানুসারে ধর্ম্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত করিয়া ধর্ম্মান্ধতার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করার যুগ চলিয়া গিয়াছে; আবার street barricade, individual terrorism দ্বারা দেশ স্বাধীন করার যুগও চলিয়া গিয়াছে! peter the Hermitএর যুগও নাই, Mazzini ও Bakuninএর যুগও আর নাই! এক্ষণে নূতন যুগের নূতন আদর্শ ও নূতন কার্য্য প্রণালী। ইহা "radical" বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য বস্তু হইতেছেন যুবকশ্রেণী।

তাঁহারা স্বদেশের জন্য কি করিতে পারেন ইহাই আমাদের বিবেচনার স্থল আমাকে এই স্থলে আহ্বান করা হইয়াছে যে, আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করি !

বিদেশে সকল প্রকারের লোকের সহিত মিশিয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেক দলেরই আদর্শ সুস্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হয়। ইহাতে কোন গোজামিল থাকে না। প্রত্যেক কার্য্যেরই পশ্চাতে একটি দর্শনশাস্ত্র আছে। তৎপরে, তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত করা হয়। কি জন্যে কোন একটি কার্য্য করিব; তাহাতে আমার ও আমার শ্রেণীর দলের কি স্বার্থ আছে এই সব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিষ্কাররূপে জানেন এই জন্যই তাহারা **Goal conscious ও class conscious** হন (আদর্শ ও শ্রমিকদলের স্বার্থ ভাল প্রকারে বুঝেন) আর আমাদের দেশের আজকালকার জাতীয় জীবনের গুটিকতক কর্ম্মের পদ্ধতির অনুসন্ধান করা যাউক। প্রথমে রাজনীতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক ; এবং দেখি আমাদের রাজনীতির একটা creed নাই, কর্ম্মপদ্ধতির একটা প্রোগ্রাম নাই, উদ্দেশ্য (goal) যে কি তাহাই আজ পর্য্যন্ত ঠিক হইল না ! তৎপর, আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে "গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি" (**constructive program**) অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার অর্থে সাধারণে কি বুঝেন তাহা জানিনা, বোধ হয় ইহার অর্থে লোকে বুঝেন, পুষ্করিণী হইতে কচুরী পানা উত্তোলন করা, ম্যালে-

রিয়া নিবারণ করা, বাড়ীর কাঁনাজ পরিষ্কার করা এবং বড় বেশী একটা প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা ইত্যাদি।

কিন্তু Constructive program অর্থে আমি অন্য ব্যাপার বুঝি। রুষে বোলচেভিক পার্টির maximum program যাহা ছিল তাহাই তাহাদের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি। যে দিন রাজশক্তি তাঁহাদের হস্তে আসিয়াছে, সেইদিন তাঁহারা "The program of the Bolscheviki" সমাজের গঠনমূলক কার্য্যের নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নব্যতুর্কদের যে program ছিল তাহা এতদিন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ কেমালের হস্তে রাজশক্তি আসাতে তিনি তাহা প্রয়োগ করিতে সমথ হইতেছেন! নব্য চীনাদের কথাও তদ্রূপ; সেই জন্য বলি,আমরা Constructive program অর্থে কি বুঝি ; এই প্রোগ্রামের কর্ম্মতালিকা ও কর্ম্মপদ্ধতিই বা কি? ইহা একটা রাজনীতিকদের ছেঁদো কথা হইয়াছে। এ কথা আমি নির্ভয়ে বলিতেছি, ভারতে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির (Constructive program) অর্থ এই—বিভিন্ন জাতি, চর্চ্চা ও ধর্ম্ম সমন্বিত লোক সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আর্থনীতিক ভিত্তির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতকে চর্চ্চা, সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক দিয়া (Culturally, socially and economically) একটা একত্ব প্রাপ্ত জাতিরূপে (homogeneous nation) গড়া। ইহার মানে :—সমাজ আর্থনীতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ; রাজনীতি, অর্থনীতির দিক প্রদর্শনকারী যন্ত্র মাত্র। রাজ-

নীতিক জোড়াতাড়া দিয়া ভারতের বিভিন্নস্তরের লোকের বা বিভিন্ন স্তরের সভ্যতায় অবস্থিত মানবের ঐক্যতা বা একজাতীয়তা সম্ভব নহে। ভারতে একজাতীয়ত্ব আনিতে হইলে আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, এবং সেই পরিবর্ত্তন ভিত্তি হইতেই করিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্ম যাহা **maximum program** তাহা হস্তে লওয়া সে দিন সম্ভব হইবে যেদিন একটা **enlightened radical** দলের হস্তে রাজশক্তি আসিবে। ভারত স্বাধীন হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার অবস্থাকেই উন্নত অবস্থা বলে না। আবিশিনিয়া, আফগানিস্থান ও স্বাধীন কিন্তু এই সব দেশে সভ্য ও উন্নত দেশ মধ্যে গণ্য হয় না।

এই সঙ্গে **Social service**এর কথা আসে আজকাল জন-সেবা বা সমাজসেবার খুব ধুম উঠিতেছে। সর্ব্বত্রই জনহিতকর সমিতি বা সঙ্ঘ স্থাপিত হইতেছে। ইহা সমাজের একটি আশাপ্রদ চিহ্ন। কিন্তু **Social service** অর্থে সাধারণে কি বুঝেন? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় "কেন মড়া পুড়ান ও রোগীর সেবা করা"! ইহাও উপরোক্ত গঠনমূলক কার্য্য পদ্ধতির ন্যায়! অজ্ঞতার জন্যই **Social service** এর এই সংকীর্ণ মানে আমাদের দেশে করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার অর্থে অতি বিশাল সমাজতত্ত্বের চর্চ্চা হই-তেই "জনসেবা পদ্ধতি" সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে **applied sociology** (ফলিত সমাজতত্ত্ব) ও বলা হয়। সমাজ তত্ত্বের বিশেষ চর্চ্চার দুইটি কেন্দ্র আছে"—ফ্রান্স ও আমেরিকা। কিন্তু শেষোক্ত দেশেই এই চর্চ্চাকে ফলিত বিজ্ঞানে পরিণত করা হইয়াছে। সে

দেশে যে'সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব আলোচনার বিশদ ব্যবস্থা আছে তথায় সেই সঙ্গে Social service এর কর্ম্মপদ্ধতিকে practical Sociology রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। জনসেবাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত করিবার জন্য Rowntree নামক একব্যক্তি লণ্ডনে গরীব শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন তাঁহার Statistical method of enquiry অর্থাৎ Statistics অঙ্ক দ্বারা অনুসন্ধান করা হয় প্রত্যেক গোষ্টির দৈনিক বা সাপ্তাহিক আয়ই বা কি, তাহাদের দৈনিক বা সাপ্তাহিক ব্যয়ই বা কি, তাহাদের আয় অনুপাতে Standard of living কি প্রকার, স্বাস্থ্য কি প্রকার ইত্যাদি আমেরিকায় গৃহীত হয় এবং তথায় তাহার উৎকর্ষ সাধন করা হয়। আমেরিকায় আজকাল সমাজতত্ত্বীকেরা"regional study"করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা এক কারখানা কুলীদের আবাস স্থলের পুরা বা এক অংশ লইয়া অনুসন্ধান করেন সেই সীমানার মধ্যে লোকদের স্বাস্থ্য কি প্রকার,কি ব্যায়রাম বর্ত্তমান আছে, তাহার কারণ কি ? চিকিৎসার কি বন্দোবস্ত আছে? প্রত্যেক ব্যক্তি দৈনিক বা সাপ্তাহিক কত উপায় করেন ? আহারের জন্য প্রত্যহ কত খরচ করেন ? কি কি দ্রব্য আহার করেন এবং তাহার পরিমাণ কত, পরিচ্ছদের জন্য কত ব্যয় করেন, তাহা পরিষ্কার রাখা হয় কিনা ? গৃহাদি লোকানুসারে প্রশস্ত কিনা, প্রত্যেক গোষ্টি থাকিবার জন্য পর্য্যাপ্ত ঘর কোম্পানী হইতে পান কিনা ? এই স্থলের লোকেরা

সুস্থ কিনা? তাহাদের পুত্রাদি সুস্থ ও সবল হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে কি না? শিক্ষার ও খেলায় কি ব্যবস্থা আছে? নৈতিক চরিত্রের অবস্থা কি প্রকার? এক কথায় এই স্থানের অধিবাসী-দের standard of life কি প্রকার? তাহা দ্বারা দেশের সভ্যতার হানি হইতেছে কি না? মূল জীব জাতি (race) শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিষয়ে উন্নতি কি অবনতির পথে যাইতেছে তাহা এবম্প্রকারের social serviceএর তথ্য। ইহাতে দৃষ্ট হয় সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে একটি নূতন বিজ্ঞানে আমরা উপনীত হই। এই বিজ্ঞানের নাম Eugenics. জনসেবা-পদ্ধতির পশ্চাতে এই বিজ্ঞান রহিয়াছে।

আমি এই স্থলে রাজনীতি, গঠনমূলক কর্ম্ম ও জনসেবা এই তিনটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বিদেশের সহিত তুলনা করিলাম--কারণ প্রদর্শন করিতে চাই আমরা সমাজের সর্ব্ববিষয়ে কত পশ্চাৎপদ রহিয়াছি এবং এই সব বিষয়ে কত কম ধারণা আমাদের আছে! এই সব কার্য্য আমাদের নিকট ছেঁদো কথা হইয়া রহিয়াছে। এই সব বিষয়ে আমরা গঠনমূলক কোন কর্ম্মই করি নাই।

এইস্থলে স্বতঃই একটি কথা উঠিবে, আমরা এবম্প্রকারের পরাধীনভাব অবস্থায় কি প্রকারে উন্নত হইতে পারি। বিচার করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যতদিন শাসন শক্তি আমাদের হস্তে না আসিবে ততদিন আদর্শানুযায়ী পূর্ণ উন্নতিবিধানও আমরা করিতে অসমর্থ হইব। তবে, এই অবস্থায়ও উন্নতির

পথে আমরা কিয়দংশ অগ্রসর হইতে পারি। নিজেদের অগ্রগামী ও উন্নত করিবার উপায় কতকটা আমাদের হস্তেই রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় কার্য্যকরী শক্তিকে (race capacity) প্রবুদ্ধ করিয়া তদ্বারা অনেক উন্নতির কার্য্য করা সম্ভব। কেবল চাই, নূতনাদর্শ ও চাই কর্ম্মস্পৃহা।

জীবতত্ত্বীক পণ্ডিতেরা বলেন, মস্তিষ্কের আলোড়ন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়। সতেজ মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চলও জড়বৎ হয় না, কারণ মস্তিষ্কও স্নায়ু (nerve) একপদার্থ ও সংশ্লিষ্ট নিষ্ক্রিয় ও জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের একটি উচ্চাবস্থা হইতে পারে বটে কিন্তু সে অবস্থা দ্বারা ইহ জগতে অগ্রসর হওয়া যায় না। জগতে কেবল মস্তিষ্কের তেজের লীলা খেলা হইতেছে। যে জাতি যত মস্তিষ্কশালী সেই জাতি তত চেষ্টাশীল এবং সেই জাতি সমস্ত বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া জগতের পুরোভাগে স্থান অধিকার করে।

সত্যই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বোয়াস্ একবার কতিপয় ভারতবাসীদের বলিয়াছিলেন, "If the Indians were equal in intelligence with the Europeans, they would have found ways and means to become independent" (যদি ভারতবাসীরা ইউরোপীয়দের ন্যায় বুদ্ধিশালী হইত, তাহারা স্বাধীন হইবার রাস্তা এবং উপায়ও আবিষ্কার করিত)। অধ্যাপক বোয়াসের এই সমালোচনা সত্য কি না তাহার তর্ক এই

স্থলে উত্থাপন না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ভারতবাসীর মস্তিষ্কের সুষুপ্তাবস্থাই তাহার অধঃপতনের মূল কারণ। যে জাতি যত জাগ্রত, সে জাতি স্বাধিকার রক্ষায় তত চেষ্টিত ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সতত যত্নবান।

আমাদের তরুণদের সতেজ মস্তিষ্ক, সবল হৃদয় ও সুস্থ শরীর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আশীবিষের বন্ধন আমাদের সর্ব্বদিকেই ঘিরিয়া আছে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে তাহাতে "মানুষ" হওয়ার উপায় নাই এবং উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দানেরও কোন ব্যবস্থা নাই। এই জন্যই আমাদের ছাত্রেরা B. A, M , A, ডিপ্লোমা লইয়া স্ফীতবক্ষ হইলেও প্রতীচ্য দেশের উক্ত ডিপ্লোমাধারী ছাত্রের তুলনায় বিশেষ অজ্ঞ! আমার বিশ্বাস, স্বরাজ পাইবার জন্য যে সব মুষ্টিযোগের বিধান হইতেছে তাহা অপেক্ষা ছাত্রেরা যদি Experimental Biology, Comparative and Experimental zoology ; experimental and applied Psychology, Biochemistry, Physics Theoretical and applied sociology প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা সমূহ পাঠ করিতে পায় তাহা হইলে স্বতঃই স্বরাজের রাস্তায় আমরা অনেকটা অগ্রসর হইতে পারি। অজ্ঞতাই আমাদের বিষাক্ত গণ্ডীর (vicious circle) মধ্যে রাখিয়াছে এবং তজ্জন্য নানাপ্রকারের বাদবিসম্বাদ মূর্খতা, ধর্ম্মান্ধতা ও উদ্ভট ব্যবস্থার অবতারণা করে।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অধঃপতিত জাতি সমূহের উত্থানকল্পে সেই

সব জাতির যে সব তরুণ আত্ম ও স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের ফলিত-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কারণ, প্রথমতঃ যাহারা পরকে মুক্তির উপায় বলিয়া দিবে, তাহাদের নিজেদের মনকে মুক্ত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, জগতের প্রতি নূতন ধারণা করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন। আমাদের দেশেও তরুণদের তদ্রূপ দেশের কার্য্যের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। যাঁহারা দেশের মুক্তেচ্ছুক হইবেন তাঁহাদের নিজেদের মনকে প্রথমে মুক্ত করা চাই। বিমুক্ত মন লইয়া তাঁহাদের জন সাধারণের মধ্যে গিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে তাহা "study circle" করিয়া আলোচনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে; কর্ম্মীদের দেশের ইতিহাস রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন, এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়েও পরিচয় থাকা দরকার। শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের সাধারণের জ্ঞানের অভাব! প্রতীচ্য দেশের মজুরেরা স্বদেশের রাজনীতির গতি ও অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সহিত পরিচয়ের যে নিদর্শন প্রদান করে। সে জ্ঞান আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশা করা যায় না!

এই সম্মিলনীর যুবকদের আমি বলি, দেশের কার্য্য করিবার সময় তাঁহারা যেন জ্ঞান ও বিবেক উভয়কে প্রয়োগ করেন! প্রথমে

তাঁহাদের, বিচার করা উচিত স্বরাজ অর্থে কি বুঝি? অবশ্য এ বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন অর্থ করিবেন। ভারতের যে সব রাজারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত "মিত্রতা বা করদ" সম্পর্ক সূত্রেআবদ্ধ আছেন,তাঁহাদের নিকট স্বরাজ নিজেদের 'রাজ্য' বলিয়া প্রতীত হইবে। তাঁহাদের "স্বরাজ" আছে যদিচ পূর্ব্বেকার মতন যথেচ্ছাচার করিবার ক্ষমতা হইতে সম্রাটশক্তি (Suzerain power) তাঁহাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। অবশ্য সমস্ত সভ্য দেশেই রাজতন্ত্র (monarchy) নিয়মতন্ত্রাধীন হইয়াছে। আমাদের রাজারা স্বীয় প্রজাদের নিকট ততটা নিয়ম তন্ত্রাধীন এখনও হন নাই, তবে বিশেষ ভাবে বর্ব্বরতা করিবার আর ক্ষমতা নাই। এক্ষণে তাঁহাদের যে "স্বরাজ" আছে তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। ১৮৫৩ খৃঃ পর হইতে ইংরেজ-নিগড় হইতে ভারতীয় রাজারা মুক্ত হইতে না পারিয়া এক্ষণে সম্রাটশক্তির প্রধান সহায়রূপে বিরাজ করিতেছেন। আজ তাঁহারা জানেন, দেশের বর্ত্তমান সাম্যবাদের ঢেউয়ের সম্মুখে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন না; সেই জন্য তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনাবস্থায় যাহা হইয়াছে ভারতেও তাহা বিবর্ত্তিত হইতেছে। পোলাণ্ডের ও জারের অধীনে রুষ সাম্রাজ্যের ব্যালটিক প্রদেশ সমূহের প্রাচীন আভিজাত্যবর্গ এই প্রকারে রুষীয় সম্রাটশক্তির সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছিল। পোসেন নামক পোলাণ্ডের যে অংশ প্রুসীয়ার

অধীনে ছিল তথাকার আভিজাত্য বর্গের অনেকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য বাদী হইয়াছিল (প্রিন্স লিখনোস্কিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত !)। তৎপরে, আসে দেশের জমিদার,তালুকদার প্রভৃতি landed aristocracyর কথা। এই শ্রেণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র রক্ষণশীল ; ভারতেও তাহার বৈচিত্র্যতা ঘটে নাই ! ভারতে এই দল land capitalist রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাদের স্বরাজ প্রায়ই আছে। ইহারা কখন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিবেন না। নিজেদের স্বার্থরক্ষাই এই শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য। যদি দেশ স্বাধীন হইলে তাঁহাদের কোন ক্ষতি না হয়, এবং গায়ে আচড় না লাগাইয়া যদি দেশোদ্ধার কার্য্য (তাও উপরোক্ত সর্ত্তানুসারে !) করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করিতে পারেন। ইহারা অগ্রে নিজেদের "vested interests" বাঁচাইয়া অন্য কোন কার্য্য করিতে রাজী হন ; তজ্জন্য স্বাধীনতা বা স্বরাজ আন্দোলনে ইহাদের প্রাপ্ত হওয়া যাইবেনা। ইহার পর আসে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা। এই শ্রেণী স্বভাবতঃ দুইভাগে বিভক্ত—উচ্চাবস্থার শ্রেণী ও গরীবাবস্থার শ্রেণী। Chelmsford-Montague Reforms প্রাপ্ত হওয়ার পর, উচ্চাবস্থার শ্রেণীর লোকের ব্যক্তিগত ভাবে "স্বরাজ" প্রায়ই হস্তে আসিয়াছে। ইঁহাদের মন্ত্রী, গভর্ণর, Under-secretary of state for India, Member of the India Council প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিবার রাস্তা খোলসা হইয়াছে। আর পূর্ব্বে, রেলে, হোটেলে শ্বেতাঙ্গদের

নিকট যে অপমানিত হইতেন এক্ষণে তাহাও বিশেষ কম হইয়াছে। তবে যেটুকু স্বরাজ পাইবার বাকি আছে. তাহার জন্যই ইঁহারা "জাতীয় আন্দোলন" চালাইতেছেন।

ভারতের সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের পূর্ণ "স্বরাজ" পাইবার যেটুকু বাকি আছে তাহারই জন্য তাঁহারা Home Rule, Autonomy, Dominion status প্রভৃতির দাবী করেন, কারণ ভারতের ধনের উৎপত্তিস্থলসমূহ (means and instruments of production) এখনও তাঁহাদের হস্তে আসে নাই। ভারতীয় সম্পত্তিশালী শ্রেণীসমূহের রাজনীতির উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের প্রকৃতিদত্ত ধনসম্ভার (natural resources) যাহা বিদেশী কর্তৃক শোষিত (Exploited) হইতেছে তাহার উপর হয় পূরা না হয় অংশীদারের স্বত্ব স্থাপন করা। ব্যবসাদার শ্রেণীর স্বদেশ-প্রেমিকতাকে "ন্যাশন্যালিসম" বলিয়া অভিহিত করা হয়। সেইজন্য "ন্যাশন্যালিসমই" আমাদের রাজনীতিক আদর্শ হইয়াছে।

এদেশের সম্পত্তিশালী শ্রেণীসমূহের অনেকেই সুশিক্ষিত নন বলিয়া তাঁহার নিম্নের শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের দাবীর দালালি করেন। এই গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তার ধারা (petty bourgeois mentality) এক অদ্ভুত প্রকারের! এই শ্রেণীর লোক অবস্থা ভাল হইলে দলছাড়া হইয়া যান। ইঁহারা উপরের শ্রেণীকে আদর্শ করিয়া ক্রমাগতই উপরের দিকে তাকা-

ইয়া থাকেন এবং স্বশ্রেণীর ও সবংশের অতীত বিস্মরণ করেন! এইজন্যই ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক শিক্ষিত হইয়া আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, লেখক প্রভৃতি লোক অবস্থাপন্ন ও নামজাদা হইলে স্বীয় শ্রেণী ত্যাগ করিয়া উপরের শ্রেণীদের ওকালতী করেন! ইহার কারণ, মনে এই আশা যে "আমার টাকা ও খ্যাতি হইলে আমিও উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া আভিজাত্যবংশীয়দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের একজন হইব—কালে আমার বংশীয়েরা feudal baron বংশীয় বা সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহাদের পিতৃপুরুষদের হীন উৎপত্তি ও অবস্থা সমাজের স্মৃতি হইতে লোপ পাইবে"! এসম্প্রকারের মানসিক অবস্থার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ—আমেরিকান সমাজ! সেথাকার দেশের কন্সটিটুশান বলে, "All men are born free and equal" কিন্তু অনেক লোকের অবস্থা ভাল হইলেই ইউরোপীয় feudal বংশ হইতে নিজেদের উৎপত্তি টানে! আর যাঁহারা "রাজা-রাজড়ার" সম্পর্ক টানিতে না পারেন, তাঁহারা May-flower যাত্রীদের বংশধর বলেন বা Sons & daughters of the Revolution বা "sons and daughters of the civil war" সমিতি করিয়া এই সব ঐতিহাসিক ঘটনায় সংলিপ্ত পুরুষদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেদের সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া "আভিজাত্য" উৎপত্তির গর্ব্ব করেন! অধ্যাপক

ষ্টাইনারকে এক বক্তৃতাতে বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমেরিকার অনেক যুবক তাঁহার নিকট বলিয়াছেন যে, "তাঁহাদের পিতৃপিতামহেরা যে শ্রমিক ছিলেন এমন কোন জনশ্রুতি তাহাদের বংশে নাই!" ষ্টাইনার ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "তোমার নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করা উচিত যে তোমার উত্তর-পুরুষেরা হাতুড়ি পিটিয়া শাবল চালাইয়া রুটি রোজগার করিতেন"! আমেরিকায় অর্থও শিক্ষিত হইলেই সকলেই বিস্মরণ করেন যে ইউরোপের প্রপীড়িত, নির্য্যাতীত ও লুণ্ঠিত কুলী, মজুর ও চাষীরাই আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও সেই অনুষ্ঠান ধারাবাহিক চলিতেছে! এই মানসিক অবস্থা petty-bourgeois mentalityর একদিক।

আমাদের দেশের নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরা সম্পত্তিশালী শ্রেণীসমূহের তরফদারি করেন। সেইজন্য ভারতীয় রাজনীতিতে এখনও নির্ধন শ্রেণীসমূহের দাবী দাওয়ার কথা উত্থাপিত হইতে পারিতেছেনা। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাও অবস্থাবিশেষে যখন অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হন তৎকালে তাঁহারা মন্ত্রীত্ব, ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্যের পদ পাইবার আশা ও দাবী প্রাপ্ত হন। কারণ,ইংরেজ মূলধনী সম্প্রদায় (Capitalist class) যাহা ব্রিটিশ সম্প্রদায় শাসন করিতেছেন, তাহা Mont-Ford Reform অনুসারে ভারতীয়দের যে Suffrage দিয়াছেন তাহাতে টাকার থলীর প্রাধান্যই নির্দ্ধারিত করা

হইয়াছে। property qualificationভারতের Suffrageএর ভিত্তি, আর money qualificationই ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রের চাবি! এইজন্য এইসব লোকেরও "স্বরাজ"অর্দ্ধকরতলগত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতের জাতীয়তাবাদের (Nationalism) মূল অর্থ হইতেছে—ব্রিটিশ বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীকে হয় ভারতের Economic exploitation হইতে বঞ্চিত করা, না হয় সেই দলের সহিত বুঝাপড়া করিয়া ভারতীয় ধনশোষণের ব্যাপারে অংশীদার হওয়া। তাই Round Table Conferenceই বর্ত্তমান রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ; কারণ যদি দুই দলে একটা "গোলটেবিলের" চারিধার বসিয়া ভাগ বাটোয়ারা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত ঝগড়াই মিটিয়া যায়, এবং "Indian movement for freedom-এরও তথায় অন্তকরা যায়! আর তাহা হইলেই দুই দলই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বিগত জগৎব্যাপী যুদ্ধের সময় বিনা ক্লেশে "স্বরাজ" পাই-বার জন্য ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণী ও তথাকথিত নেতারূপে গভর্ণমেণ্টের তরফদারি করিয়াছিলেন-আশা ছিল তাহার বিনিময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে 'Home-rule' (স্বায়ত্ব-শাসন) প্রদান করিবে। বৈপ্লবিকেরা সেই সময়ে যখন স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণদান করিতেছিলো সেই সময় ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অন্য সুরে

গাহিতেছিলেন! কিন্তু Mont-ford Reforms দ্বারা স্বরাজের একটা Caricature মিলিল দেখিয়া যাঁহারা অনেক আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষোভে ও রোষে 'অসহযোগ আন্দোলন' আরম্ভ করেন। ইহারা বৈপ্লবিকদের দেখিতে পারেন না, সেই হতভাগাদের নাম শুনিলে এই স্বদেশ-প্রেমিকদের গাত্রদাহ হয়, তাহাদের সর্ব্ব বিষয়ে "পারিয়া" করিয়াছেন কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা প্রতীচ্য সামাজিক বৈপ্লবিকদেরই tactics ও policy অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ ইহারা স্বজাতীয় জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিকদের (nationalist revolutionaries) ঘৃণা করেন, কিন্তু বিজাতীয় সমাজ বৈপ্লবিকদের উপায় ও প্রণালী গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই জন্যই সেই সময়ের বৈদেশিক সংবাদ পত্রে বাহির হইত যে, ভারতের ,'অসহযোগ আন্দোলন" অর্দ্ধ ন্যাশন্যালিষ্ট ও অর্দ্ধকমুনিষ্ট আন্দোলন।

যাহাই হউক ভারতীয় বুর্জোয়া ও ক্ষুদ্র-বুর্জোয়ার দলের জাতীয়তাবাদের ও স্বাধীনতাবাদের দৌড় ঐ গোলটেবিল কনফারেন্স পর্য্যন্ত। কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন, History repeats itself, once as farce, once as tragedy (ইতিহাস একবার প্রহসন রূপে একবার বিয়োগান্ত নাটকরূপে পুনরাভিনীত হয়)! ভারত ইতিহাসে, এই বাক্য এই ভাবে প্রযোজ্য হয় যে, যখন বৈপ্লবিকেরা স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছিলেন তৎকালে, আজ যাহারা স্বদেশপ্রেমিকতা ও স্বাধীনতাবাদের সুর গাহিতেছেন তাঁহারা অন্য তালে নাচিতেছিলেন। পরে, আশায় ছাই

পড়াতে নৃত্যের 'প্যয়লা' মনোমত না হওয়াতে ইহারা ইউরোপীয় বৈপ্লবিকদের উপায় ও প্রণালী গ্রহণ করিয়া অত্যল্প সময়ে দেশকে স্বাধীন করিতে উদ্যত হইলেন ইহাই হইল প্রহসন। সেই সময় হইতে "খাঁটি" স্বদেশপ্রেমিক নেতৃবর্গ অনেক ডিগবাজীই খাইলেন 'এই স্থল হইতে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আরম্ভ একবার হুজুগ হইল সর্ব্ব বিষয়ে অসহযোগ, তারপর হুজুগ হইল কাউনসিলে ঢুকিলেই স্বরাজের সুরাহা হইবে, তারপর সে রাস্তাহইতে আর একদল খসিয়া পড়িলেন,তাঁহারা বলিলেন,responsive co-operation করিতে হইবে; এক্ষণে জাতীয়তাবাদের স্থানে সাম্প্রদায়ীকতাই বিরাজ করিতে আরম্ভ করিতেছে। ইহাতেই বলি,মার্ক্সের বুলি ভারতীয় তথাকথিত 'জাতীয় আন্দোলনে' সফল হইতেছে। যথাঃ Non-co-operation, swaraj party,Responsive Co-operation, Communalism—ইহাই হইতেছে আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতির বিবর্ত্তন। এক্ষণে দেখা যাক, অপরাং বা কি ভবিষ্যাসি।

অসহযোগ আন্দোলন যেটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহা গণ-শ্রেণীর জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। তাহাদের ধর্ম্মের নামে ক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। আর গণসমূহ এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল বলিয়াই ইহার বিশেষত্ব। অতএব দৃষ্ট হয়, গণসমূহই আমাদের দেশের মূল সহায়। উপরে উক্ত হইয়াছে, যেমন মোল্লার দৌড় মসজীদ পর্য্যন্ত আমাদের বুর্জ্জোয়াদের স্বাধীনতালিপ্সার দৌড়ও ঐ

গোলটেবিল পর্য্যন্ত। কাজেই গণশ্রেণী স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ্য ও শেষ সহায়; কারণ তাহাদের স্বরাজ দিবার ব্যবস্থা কেহ করেন নাই। এই নিরক্ষর বাকহীন গণশ্রেণীকে মুক্তির বাণী শুনাইয়া জাগ্রত, সংঘবদ্ধ ও শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। স্বরাজ তাহাদের জন্য; তাহাদের কোন কালে স্বরাজ ছিল না। দূর অতীতকাল হইতে তাহারা অনেক প্রকারের অধীনতার পাশে বদ্ধ হইয়াছে। আর তাহারাই সমাজের শতকরা ৯৯ জন লোক! সমাজের বেশীর ভাগ লোক অর্থে গণশ্রেণীকে বুঝায়।

শ্রদ্ধেয় ৺দেশবন্ধুদাস মহাশয় বলিয়াছেন, Swaraj is for the masses, not the masses for swaraj" অর্থাৎ স্বরাজ গণশ্রেণীর জন্য, তাহারা স্বরাজের জন্য নহে। ইহার অর্থ, যে স্বরাজের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি তাহা সমাজের বেশীর ভাগ লোক বা গণসমূহের জন্য তাহারা "স্বরাজের" নামে দেশী বুর্জোয়াদের স্বার্থের বেদীতে বলির জন্য আহূত নহে। ৺দাস মহাশয় গয়া কংগ্রেসে আরও বলিয়াছিলেন যে, আমরা যেন বিদেশী আমলাতন্ত্র তাড়াইয়া দেশী আমলাতন্ত্র সৃষ্ট না করি! কিন্তু ৺দাস মহাশয়ের সেই অভিভাষণের মর্ম্ম কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? দাস মহাশয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমার বক্তব্য বলিবার আরও সুবিধা হইল। আমি, আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তির মনস্তত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি, masses (গণ শ্রেণী) আমাদের শেষ সহায় ও স্বরাজ তাহাদেরই জন্য।

এক্ষণে কথা উঠে, এই স্বরাজের স্বরূপ কি প্রকার হইবে? কেহ বলেন, "swaraj is an attitude of mind" কেহ বা স্বদেশীর অধীনে ভারত আসিলেই স্বরাজ হইবে বলেন; কেহ বা স্বরাজ অর্থে ধনতন্ত্রের প্রাধান্যকে বুঝেন ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ লোকে ইহা বিস্মরণ হন যে আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি এবং vested interest দেশকে "চৈনিক প্রাচীর" দ্বারা ঘিরিয়া রাখিবার শত চেষ্টা করিলেও যুগ-ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ এই যুগের ভাবসমূহ ভারতে ক্রমাগত প্রবেশ করিতেছে। স্বরাজ অর্থ ইহা নহে যে, ভারতকে বৈদিকযুগের pastored অবস্থাতে লইয়া যাইতে হইবে বা feudal stage এ রাখিতে হইবে বা জনকতক ধনীর ধন-বৃদ্ধির ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে হইবে বা গোটাকতক আইন ব্যবসায়ী বা ডাক্তারের বা ইঞ্জিনিয়ার বা প্রোফেসারের লীলাস্থল হইবে।

স্বরাজ মানে—নিজের রাজ অর্থাৎ সমাজকে এমন অবস্থাতে আনিতে হইবে যাহাতে সমাজ নিজের ভাগ্য নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারে। অন্য কথায়, যে অবস্থাতে সমাজ স্বীয় শাসনাধীন হইতে পারে সেই অবস্থাকে স্বরাজ বলে। সমাজের সেই অবস্থা অতি প্রাচীন কালে ছিল; কিন্তু যেদিন হইতে state এর উদ্ভব হইয়াছে সেইদিন হইতে "সমাজ" স্বায়ত্তাধীন নহে। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন আজকালকার state হইতেছে class-state অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট শ্রেণী বা লোকসমষ্টি সমাজের বেশীরভাগ লোকের

উপর বলপূর্ব্বক শাসন করে। একটি বিশিষ্ট শ্রেণী অন্যসব শ্রেণীর উপর রাজত্ব করে। ষ্টেটের অধিকারী ও সুখস্বচ্ছন্দের ফলভোগকারী একটি বিশিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায় বা লোক সমষ্টি। ইহারা হয় বিজেতৃবর্গের বংশধর বলিয়া বা ধনের তেজে অন্য লোকদের পরাধীন করিয়া শাসকশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। মুষ্টিমেয়ের এই শাসন দৃঢ় রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের যত প্রকার যন্ত্র, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে এবং সে সব শাসিতদের উপর প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সমাজমুক্ত হইলে বা তাহার "স্বরাজের" অবস্থায় "ষ্টেট" লোপ পাইবে; সমাজ নিজহস্তে সমস্ত প্রয়োজনীয় শাসনযন্ত্রগুলি গ্রহণ করিবে ও নিষ্পীড়নের যন্ত্রগুলির বিলোপ সাধন করিবে। স্বরাজ সমাজে সেইদিন আসিবে যে দিন সমাজ বর্ব্বরতার চিহ্নস্বরূপ বিজেতৃবর্গের বা একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর শাসন ও শোষন নীতি হইতে বিমুক্ত হইয়া "free man's citizenship" পরিণত হইবে।

এই সঙ্গে প্রশ্ন উঠে,"মুক্ত মনুষ্যদের নাগরিকাবস্থা"রূপ স্বরাজ-স্থিত মানবের মুক্তাবস্থা কিরূপে আসিবে? সেইদিন মানবের মুক্তাবস্থা আসিবে, যেদিন সে সর্ব্ববিষয়ে বিমুক্ত হইয়া আর্থনীতিক সাম্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। যতদিন মানব সমষ্টির মধ্যে আর্থনীতিক সাম্যতা না আসিতেছে ততদিন যথার্থ সামাজিক সাম্যতা আসিবেনা। ভবিষ্যতের এবম্প্রকারে মুক্ত মানব-সমাজ একটি বুর্জো-ক্লাশের দ্বারা পরিচালিত হইবেনা বরং স্বয়ং ধনের

উৎপত্তি ও বণ্টনের স্থলসমূহের (means of production, and distribution) কার্য্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিবে। ইহার অর্থ ভবিষ্যতের স্বরাজাবস্থায় মানবকে শাসিত করিতে হইবেনা. বরং আর্থনীতিক দ্রব্য সমূহকে বন্দোবস্ত করিয়া মানবের কার্য্যে লাগাইতে হইবে (not peoples to be governed, but things to be administered) সেই অবস্থাতে মানব আপন বৃত্তি অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্র পছন্দ করিয়া কর্ম্মানুসারে সংঘবদ্ধ হইবে এবং সংঘসমূহ প্রতিনিধি দ্বারা আর্থনীতিক দ্রব্য সমূহকে মানবের ভোগে লাগিবার বন্দোবস্ত করিবে। সমাজের শাসনশক্তি আর্থনীতিক সংঘ সমূহের সমষ্টিরূপে বিরাজ করিবে।

ইহাই হইতেছে বিংশশতাব্দীতে স্বরাজের আদর্শ। মানবের মন সর্ব্বত্রই সমান এবং এক অবস্থাতে একভাবেই কার্য্য করে। বহির্জগতের নিষ্পেষিত ও নিগড়াবদ্ধ গণশ্রেণী যে স্বরাজ চাহিতেছে, ভারতের গণশ্রেণী অজ্ঞ ও তজ্জন্য নির্বাক হইলেও সেই অবস্থা আকাঙ্খা করে। তাহারা শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া নিজেদের অধিকার ও দাবী দাওয়া গ্রহণ করিবার জন্য যখন জাগ্রত হইবে সেই সময় স্বরাজের এই আদর্শই গ্রহণ করিবে। আর, যেসব ভারতীয় সমস্যা আজ মিমাংসার অসাধ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহা এই অবস্থাতেই মিটিবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, এই আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিবে কে? যুবকদেরই এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যে সব যুবক

নিজেদের declassed (শ্রেণীচ্যুত) করিতে পারিবেন, তাঁহারাই এই কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন। যাঁহারা গরিব শ্রেণীদের উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের গরীবের মনস্তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ও সেই শ্রেণীর স্বার্থ দেখিতে হইবে।

পরলোকগত জর্ম্মাণ সমাজতত্ত্ববিদ Max Waler বলিয়াছেন, ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে জগতের বড় যুগ-প্রবর্ত্তক ভাবসমূহ অভিজাত্যশ্রেণীর লোক দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি এই সম্পর্কে ভারতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটাও ঠিক। আদি বুদ্ধ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সব বড় ভাব বা যুগ প্রবর্ত্তনের নেতারূপে এদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই রাজাও বড় ঘরানা বংশ সম্ভূত। বুদ্ধ, পার্শ্বনাথ, মহাবীর, অরিষ্টনেমী, ভর্ত্তৃহরি, মীরাবাই প্রভৃতি রাজবংশীয় ছিলেন। আর অনেকে বড় ঘরানায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রুষের আভিজাত্য বংশসম্ভূত লোকেরাই শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইয়াছেন। আমাদের বঙ্গ প্রদেশেও এপ্রকারের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই প্রদেশের রাজা ও ধনীর পুত্র ফকির হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতীতে এই বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকেরা সাম্যবাদ প্রচারের জন্য তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও তাহা অসম্ভব নহে। চাই ত্যাগী শিক্ষিত যুবকেরদল যাঁহারা আমাদের অজ্ঞমূর্খ গণশ্রেণীকে শিক্ষিত করিয়া তাঁহাদের স্বরাজ আনয়নের বাহন স্বরূপ প্রস্তুত করিবেন।

জাতি-সংগঠন

বিগত যুদ্ধের পর পৃথিবীর সর্ব্বত্র গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণী আর্থনীতিক অবস্থার দৈন্য জন্য proletarianized হইয়া যাইতেছেন অর্থাৎ আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা শ্রমিকদের সমান হইতেছেন যদিচ এই ব্যাপার তাঁহাদের নিকট এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। শ্রমিকেরা দৈনিক বা সাপ্তাহিক বেতনজীবী (wage earner) আর গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা মাসিক বেতনজীবী (pay earner) পরিণত হইয়াছেন। উভয়েই পারিশ্রমিক বেতনজীবী হইয়াছেন। বেতন না পাইলে সংসার অচল হয়। ভারতে গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থা আরও মন্দ হইতেছে, এদেশে সমাজের বিধিনিয়ম বশতঃ চাকরীজীবীদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে। তাঁহারা কেবলমাত্র "কাপুড়ে বাবু," কিন্তু অর্থনীতিক্ষেত্রে proletarianized (শ্রমিক তুল্য) হইতেছে না। শ্রেণীহিসাবে তাঁহাদের ভবিষ্যত বড় অন্ধকারময়---তাঁহাদেরও "স্বরাজ" নাই। বর্ত্তমান যুগে দেশের শিক্ষিত লোকের বেশীর ভাগ এই শ্রেণী সমুদ্ভূত। এই জন্য, স্বরাজ লাভার্থে তাঁহাদের শিক্ষা ও শ্রমিকদের শ্রম উভয়ের সমবায় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই উভয় শ্রেণী সম্মিলিত হইয়া সমাজে একজাতীয়তা আনয়নের জন্য সমচেষ্টিত হউন। সমাজ মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাদবিশম্বাদ, শ্রেণীগত স্বার্থ বিভেদ, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি যাহা বিঘ্নরূপে বিরাজ করিতেছে তাহা দূরীভূত করিয়া এক জাতীয়তা আনয়নের চেষ্টা করুন। তাহা হইলে স্বরাজের রাস্তাও মুক্ত হইবে।

আবার বলি, এই সব কর্ম্মের জন্য তরুণের দল অগ্রসর হউন। তাঁহারা এই কর্ম্ম গ্রহণ জন্য প্রথমে উপযুক্ত শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া radical mentality লাভ করুন। উপস্থিত সময়ে যথাসম্ভব অল্প আর্থনীতিক প্রোগ্রাম (minimum program) যাহা সকলে ঐক্যভাবে গ্রহণ করিতে পারেন ও কার্য্যকরী করিতে পারেন তাহা গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

আমাদের উপস্থিত সময়ে প্রধান কর্ম্মস্থল হইতেছে গণশ্রেণী। তাহাদের সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহাদের অভাব, অভিযোগ, অধিকার ও দাবীর বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। এই আর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গণবৃন্দকে সম্মিলিত করিতে হইবে। স্বার্থের মিল বড় মিল, তথায় কলহ থাকে না। এক স্বার্থের মঞ্চে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের 'বেশীর ভাগ লোকদের' (masses) একতা সূত্রে বাঁধিতে হইবে। সমাজের উপরের স্তরের জনকতক বিশিষ্ট লোকের মিলন হইলেই সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ দূর হইবে না। এই কর্ম্ম হস্তে লইবার জন্য যথা সম্ভব অল্প কর্ম্মপদ্ধতি নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রথমতঃ—এদেশের গণশ্রেণীর মধ্যে কৃষিজীবী সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহাদের সংঘবদ্ধ করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যে জাতির কৃষিজীবীরা অজ্ঞ ও পদদলিত হইয়া থাকে সে জাতির উত্থানও দুরূহ। এদেশের কৃষিরা মধ্য যুগের Feudal অবস্থার বিধিনিষেধের মধ্যে রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের আয়র্লণ্ড, রুষ, তুর্কিস্থান ও চীনের কৃষিজীবীদের আর্থনীতিক ও

তজ্জন্য রাজনীতিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস আমাদের নাজির প্রদর্শন করিয়া বলে, মুক্তিপ্রয়াসী জাতিদের কৃষিশ্রেণীর উন্নতি বিধান না করিলে 'স্বাধীনতা' বা "মুক্তির" কথা ভূয়ামাত্র !

এই সঙ্গে কারখানায় শ্রমিক, ও অন্যান্য প্রকারের কুলী মজুরদের সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেককেই তাহার দাবীদাওয়া এক বিষয়ে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। গরীব চাকরিজীবীদেরও সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। সমাজের উচ্চ পেষাজীবীরা যে প্রকারে সংঘবদ্ধ আছেন ক্ষুদ্র পেষাজীবিদেরও তদ্রূপ সংঘবদ্ধ ও শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। সংঘবদ্ধ হইয়া অভাব, অভিযোগ ও হকের বিষয়ে সজাগ থাকিলে সমাজের নির্জীব ও পদদলিত শ্রেণীসমূহ চেতনাশীল ও মুক্তিপ্রিয় হইবেন। সমাজের বেশীর ভাগ লোক যখন সংঘবদ্ধ হইয়া মুক্তিকামনা করিবেন সেই সময়ে স্বরাজ চেষ্টার আন্দোলন অন্য আকার ধারণ করিবে।

দ্বিতীয়তঃ—দারিদ্র্যপ্রপীড়িত অভুক্ত গণবৃন্দের আর্থনীতিক উন্নতির জন্য বহু প্রকারের সমবায় আন্দোলন প্রচার করা উচিত। দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তিরা কখনও মুক্তির যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, বরং সচ্ছলাবস্থার জনসমূহ এই কর্ম্মের সহায় হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিষ্পীড়িত জাতি ও গণবৃন্দ সমবায় কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা (Co-operative system) নিজেদের আর্থনীতিক মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়াছেন এবং রাজনীতিক মুক্তির সহায় হইয়াছেন। এই সমবায় আন্দোলনে আমাদের গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আর্থিক সুবিধা আছে।

এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা অনেক শিক্ষিত যুবকের বেকার সমস্যা দূরীভূত হইতে পারে। আবার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এই প্রতিষ্ঠানে একত্র কর্ম্ম করিয়া এবং এক স্বার্থে জড়িত হইয়া সম্মিলিত হইয়া এক জাতীয়তা গঠনে সহায় হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ—নিরক্ষর, অজ্ঞ গণবৃন্দের মধ্যে তাঁহাদের পতিতা অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই জন্য স্থানোপযোগী নৈশ-বিদ্যালয়, দৈনিক বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের আশু প্রয়োজন। এবং সর্ব্ব স্থানে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠন, বক্তৃতা, মেলা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। যতদিন গণ-সমূহ অশিক্ষিত থাকিবে ততদিন তাহারা শোষিত ও ধর্ম্মান্ধ থাকিবে। তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্য ও শোষণ নীতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ জ্ঞানবিস্তারের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ—গণশ্রেণীর মধ্যে Social Service (সেবাব্রত) কার্য করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, উচ্চতর সামাজিক ও আর্থনীতিকতত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে উচ্চ-হারে জীবন যাপনের (higher standard of living) প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে হইবে।

পঞ্চমতঃ—বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার ও পুস্তকালয় স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার না করিলে তাঁহারা জাগরিত হইবেন না। অজ্ঞ-

স্থাই দাসত্ব ও সর্ব্বপ্রকারের শোষণনীতির সহায়। একটি লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে অনেক কার্য্যই করা যায়। তরুণগণ এই স্থানে একটি "আলোচনা মণ্ডলী" স্থাপন করিতে পারেন এবং জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠনাদি দ্বারা জ্ঞানপ্রচার করিতে পারেন। লাইব্রেরীরূপ প্রতিষ্ঠা স্থাপনের উদ্দেশ্য কেবল নাটক নভেলের ন্যায় অসার সাহিত্যের প্রচারের জন্য নহে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণে চর্চ্চা প্রচার। যাঁহারা গ্রামে বা ক্ষুদ্র সহরে থাকিয়া বা অন্য কারণ বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বা বড় সহরের বিদ্যাচর্চ্চা হইতে বঞ্চিত তাঁহাদের নিকট জগতের চর্চ্চার সংবাদ পৌঁছিয়া দিবার জন্যই লাইব্রেরী স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। আবার এই কার্য্যকে সফল করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় ও প্রণালী অবলম্বিত হয়।

ষষ্ঠতঃ—প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের তরুণেরা অতি দুর্ব্বল শরীর বিশিষ্ট এবং তজ্জন্য কিয়ৎভাবে দুর্ব্বলচিত্ত। প্রাচীন গ্রীকদের সেই আদর্শ "প্রত্যেক নাগরিকের সবল শরীর ও সতেজ মস্তিষ্কশালী হওয়া দরকার" তাহা আমাদের গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সবলশরীর, সতেজ মনও তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের লোক হন। আমাদের :জীবনে Eugenies-বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করিতে হইবে ও তদ্দ্বারা একটি বলশালী জাতিতে ক্রমবিকাশ লাভ করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ—অর্থব্যতীত কোন কর্ম্ম হয় না। এই সব কর্ম্মের জন্য অর্থ প্রয়োজন। গণশ্রেণীর উন্নতিকল্পে ধনীশ্রেণীর অর্থদান সম্ভব নহে। যদিচ, কোন উদারচেতা ব্যক্তির এই উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রদান অসম্ভব নহে। কিন্তু জনসাধারণের কার্য্যে সাধারণের সাহায্য করা সম্ভব, এবং গণসমূহই এই কার্য্যের উপকারিতা বোধগম্য করিলে তাঁহারা স্বয়ং অর্থ সাহায্য করিবেন। এই জন্য, এই সব জনহিতকর কর্ম্ম করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি কমিটি স্থাপন প্রয়োজন।

পরিশেষে, ইহাই আমার শেষ বক্তব্য, এই স্থলে যে-সব বিবৃত হইয়াছে তাহা চিন্তা ও বিচারের বস্তু। যে জাতির মধ্যে উদার চিন্তা ও অগ্রগমনশীল শক্তি নাই সে জাতি জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না। আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা এই হওয়া উচিত যে, আমরা যেন জগতে পুনরুত্থান করিয়া উন্নতির পুরোভাগে বিরাজ করিতে পারি। তজ্জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় আয়োজন করা দরকার; এবং এই আয়োজনে উদার মতির যুবকদের কর্ম্ম বিশেষ লীলা করিবে। সেই জন্য যুবকেরা তদুপযুক্ত ব্রত গ্রহণ করুন, এবং উপরোক্ত কর্ম্মপদ্ধতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য প্রথমে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডী মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করুন। যাঁহারা জেলার মধ্যে কার্য্য করিবেন তাঁহার একখানি গ্রামকে নিজেদের প্রথম কর্ম্মস্থল করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

নূতন সাধনা

বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবন যে গভীর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে, তদ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও সমস্যাপূর্ণ হইতেছে। যে প্রকারে আমরা জাতীয় জীবনের আদর্শ ও তৎস্থলে উপনীত হইবার পথ পরিষ্কাররূপে চক্ষুগোচর করিতে পারিতেছি না, তদ্রূপ ব্যক্তিগত জীবনেও ছাত্রের দল নিজেদের জীবনের গন্তব্য অনুসন্ধান ক'রয়া পাইতেছেন না। এইজন্যই আমাদের যুবকদের জীবন এত নিরাশা, নিরুৎসাহ ও উদ্যমশূন্য হইতেছে! এই বিষয়ে স্বাধীন দেশের ছাত্রদের সহিত আমাদের দেশের ছাত্রদের মনস্তত্বের কি প্রভেদ! প্রথমোক্তদের ছাত্রজীবন আনন্দময়, আশাময়, ভরসাময়, উদ্যমপূর্ণ—জগতকে সে আনন্দের ও ভোগের স্থান বলিয়াই ধারণা করে; আর আমাদের দেশের পরাধীন জাতির তরুণদের হৃদয়ে কোন আশা, কোন ভরসা,

কোন উদ্যম বিরাজ করিতেছে কি? তাহাদের পিতৃপুরুষদের ভারাক্রান্ত জীবনের দৃষ্টান্ত এবং বর্ত্তমানের জীবন সংগ্রামের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় অবসাদ একত্রিত হইয়া আজকালকার যুবকের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলে।

ছাত্রজীবনে জাতীয় চরিত্র সংগঠনের বীজ বপন করা হয়, সেইজন্য ছাত্রজীবন আশাময় ও আনন্দময় হওয়া আবশ্যক। যে জাতির বালককে শৈশবকাল হইতে "নলিনীদলগত জলমপিতরলম ততজীবন অতিশয় চপলম," তজ্জন্য সংসার মায়া, আর এই মায়াময় জগত হইতে যত শীঘ্র পারা যায় নিষ্কৃতি লাভ করাই একমাত্র বিধেয়, এই আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই বালক যখন যুবা হইয়া জীবন সংগ্রাম কালে চারিদিকে ভীষণ প্রতিদ্বন্দিত্ব দর্শন করিয়া জগতকে নিরাশাপূর্ণ হৃদয়ে নিরীক্ষণ করিবে ও তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা করিবে, তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। এই জন্যই আমাদের জাতীয় জীবন নির্ব্বাণ প্রাপ্তি লাভ করিয়াছে! এই কারণে উপরোক্ত দোষ নিরাকরণের জন্য ছাত্রজীবনে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন।

কিশোর বয়সে মানবের হৃদয়ে যে ছাপ অঙ্কিত হয় তাহা আর প্রায়ই দূরীভূত হয় না। এই বয়সে মানব যে প্রকারের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় ভবিষ্যতে সেই সংস্কার তাহার জীবনকে পরিচালিত করে। এইজন্য উচ্চ ও যুক্তিপূর্ণ সংস্কার বালকের মনোমধ্যে অঙ্কিত করিবার জন্য কিশোরকাল হইতে ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়ো-

জন। যে World-View মধ্যে তরুণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেই world-view অনুযায়ী সে নিজকে গঠিত করে।

জীবতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, মানব প্রকৃতি (nature) শিক্ষা বা লালন (nurture) এই উভয়ের সমবায়ে পরিপুষ্ট হয়। যাহা মানবের প্রকৃতিগত অর্থাৎ উত্তরাধিকারী সূত্রে চরিত্রের যে সব লক্ষণ সে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু শিক্ষা বা লালনের দ্বারা তাহাদের কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক করা সম্ভব। এই জন্যই সভ্যজগতে শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। প্রকৃতিগত লক্ষণ সমূহ জাতীয় উন্নতির পথে সুবিধা-জনক না হইলে শিক্ষার বা লালনের দ্বারা সেই অসুবিধাকে মন্দী-ভূত করিয়া কার্য্যোপযোগী করা সম্ভব।

এই জন্য বাঙ্গালার কবি যে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী!

'রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি।'

তাহাতে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইবার কারণ দেখি না। বাঙ্গালার স্বাভাবিক প্রকৃতির গুণ তাহার অধিবাসীদের পুরুষানুক্রমিক চরিত্রে অনেক অসুবিধাজনক লক্ষণ পরিস্ফুট করাইলেও, শিক্ষা তাহার তীব্রতা হ্রাস করিয়া সে লক্ষণ সমূহকে কার্য্যোপযোগী করিতে পারে। এই জন্যই আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর বিশেষ আশা স্থাপন করিতে হইবে।

ইতিহাস পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে যে শিক্ষার দ্বারা

একটি জাতির সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি প্রভৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা একটি জাতির মনের বাহ্যিক সংস্কার সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত (heredity) লক্ষণ সমূহ পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইতে পারে না বটে, কিন্তু শিক্ষা একটা বিভিন্নতার (variability) সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক টমসনের কথায় বলা যায়, শিক্ষার দ্বারা অনৈসর্গিক ঘটনা সংঘটিত হয় না কিন্তু আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

পিতৃপুরুষদের বংশপরম্পরায় চরিত্রের এবম্প্রকারের অপরিবর্ত্তনীয় দান দ্বারা মানবকে বা মানবসমষ্টিকে স্থানুবৎ করা যেরূপ সম্ভবপর বলিয়া প্রতীত হয়, বিভিন্নতাও সেই সমষ্টি মধ্যে নূতনকে সৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চার করে; কারণ শিক্ষা বা চর্চ্চার গুণ সমূহ উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা সম্ভবপর না হইলেও, ইহা দ্বারা বিভিন্নতা উৎপাদনকারক উদ্দীপনাসমূহ (stimuli) আনয়ন করে যাহা দ্বারা নূতনকে সৃষ্ট করা যায়।

জীবজগতে বিভিন্নতার দ্বারা নূতনের আবির্ভাবকে ধারা বহির্ভূত অনুষ্ঠান (mutation) বলে। ইহা বংশের ধারা বহির্ভূত একটি নূতন আবির্ভূত অনুষ্ঠান। যাহাকে মৌলিকত্ব বলা যায় তাহাকে এই খাপছাড়া অনুষ্ঠানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া হয়ত ব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই পুরুষপরম্পরার ধারা হইতে বহির্ভূত বিভিন্নতা বা পার্থক্য দ্বারা অগ্রগমনশীল গতির নূতন

রাস্তা প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা ক্রমবিকাশের গতি বৃদ্ধিই করে, এবং এই নূতন রাস্তা দ্বারা জীবসমষ্টি লাভবান হয়।

যাহারা পুরুষানুক্রমিক চরিত্রে লক্ষণসমূহ অপরিবর্ত্তনীয়, অজ্ঞাত ও অক্ষয় বলিয়া কোন এক মানবজাতিকে অভিসম্পাত করিতে চাহেন, তাঁহাদের জীবতত্ত্বীক এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে জন্তুদের লালন পালনের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে তাহা তাহাদের জীবনশক্তির (Germ-plasm) উপর এমন উদ্দীপনার প্রভাব বিস্তার করে যাহা দ্বারা সন্ততিগণ নূতন ধারা অবলম্বন করে! পরিবর্ত্তন জীবের উপকারক হয়, এবং হয়ত শিক্ষা বা লালন-পালনের উন্নতি দ্বারা বিভিন্নতা আনয়ন করিয়া গৌণভাবে প্রকৃতি বা পুরুষানুক্রমিক অপরিবর্ত্তনীয়তার ধারার উন্নতি সাধন সম্ভব হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে জীবজগতে যাহা সত্য সমষ্টিভাবেও তাহা সত্য। সমষ্টি মধ্যে শিক্ষা বা লালনের কার্য্যকারিতাও তদ্রূপ। একটি লোকসমষ্টি সমাজে পরিণত হইলে তাহার পুরুষানুক্রমিক যে ধারা বাহিত হইয়া জাতীয় চরিত্রে পরিণত হইয়াছে তাহাতেও নূতন শিক্ষা বা লালনের দ্বারা বিভিন্নতা উৎপাদন করা যায়। যাঁহারা বলেন সমাজের ধারা অপরিবর্ত্তনীয় এবং সেই সমাজের ইতিহাসের গতি দেখিয়া তাহার ভবিষ্যতের গতি নির্দ্ধারিত হইবে তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত জীবতত্ত্বীক সত্য অজ্ঞাত। মানবসমাজ পরিবর্ত্তনশীল, কখনও স্থাণুবৎ বসিয়া

থাকে না। সেই জন্য তাহার social heredityর ধারা কখনও চিরন্তন ভাবে এক খাতে বাহিত হয় না। যে স্থলে সমাজ স্থাণুবৎ রহিয়াছে, এবং সেই জন্য তাহার সভ্যতা উন্নতির পথে বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সমাজের লোকসমষ্টি জগতে আর নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারে না। যে প্রকার জীবকে বাঁচিবার জন্য বাহিরের নব উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া সাধন করিতে হয়, তদ্রূপ সমাজ ও প্রতিদ্বন্দি জগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জড় জগতের ও ভাবরাজ্যের নূতন উদ্দীপনাসমূহ, প্রতি প্রতিক্রিয়াশালী না হইলে অর্থাৎ নূতনাবস্থানুযায়ী নিজকে পরিবর্ত্তিত না করিলে সেই সমাজের মৃত্যু অনিবার্য্য।

একটি জাতির পুরুষানুক্রমিক ধারা যাহাই থাকুক সেইজাতি জগতের নূতন ভাবসমূহের ও তাহাদের কার্য্যকারিতার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। যে স্থলে তাহার জাতীয় কার্য্যকারিতার শক্তির অভাব হয় সেইস্থলে তাহাকে নূতন শিক্ষা দ্বারা সেই অভাব পরিপূরণ করিতে হইবে। নূতন শিক্ষার দ্বারা সেই জাতির সভ্যদের মনে ব্যক্তিগত ভাবে ও তজ্জন্য সমষ্টিভাবে নূতন World-Viewর উদয় হয় অর্থাৎ জগতকে নূতন ভাবে নিরীক্ষণ করে ও তদ্রূপ ব্যবহার করিবার জন্য নূতন কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করে। এই নূতন শিক্ষার ফলে নূতন মন প্রাপ্ত হওয়াতে জাতির মনে প্রাচীন ধারা হইতে যে বিভিন্নতা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা জাতীয় জীবনের নূতন কার্য্যপ্রণালীর অবতারণা করিয়া সে জাতির

নূতন জীবন লাভ হয়, এবং বিবর্ত্তনের নূতন পথে অগ্রসর হয়।

একটি জাতির কার্য্যকরী শক্তি তাহার শিক্ষা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। নূতন শিক্ষার দ্বারা তাহার মন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে সেই জাতির ইতিহাসও পরিবর্ত্তিত হয়। আমেরিকার সমাজতত্ত্বের পিতৃস্থানীয়, আমার পরলোকগত অধ্যাপক লেষ্টর ওয়ার্ড বলিয়াছেন, একটি জাতির World-View (জগতের প্রতি ধারণা) পরিবর্ত্তিত করিয়া দাও সেই জাতিও বদলাইয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ—নব জাপান, নব চীন, নবতুর্ক, নব রুষ প্রভৃতি।

এতক্ষণে আমরা জীবতত্ত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই সমাজতত্ত্বীক তথ্যে উপনীত হইলাম, যে, প্রকৃতিগত চরিত্রের লক্ষণ অবিনশ্বর হইলেও শিক্ষার দ্বারা তাহা অভিভূত করা যায় এবং তদ্বারা প্রাচীন ধারা হইতে বিভিন্নতা সৃজন করিয়া নূতন মন গঠিত করিয়া সেই জাতিকে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিত করাইতে পারা যায়। যদি একটী জাতি জগতকে নূতনভাবে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, তাহার ভবিষ্যতের ইতিহাসও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইবে।

এই তথ্য আমরা ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিয়া দেখি—আমাদের সভ্যতা অনেকদিন মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহার ক্রমবিকাশের রাস্তায় অনেকদিন পূর্ব্বে বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়াছে। জাতীয় হিসাবে ও তৎফলে সভ্যতা হিসাবে আমরা জগতের অতি পশ্চাৎদিক অধিকার করিয়া আছি। প্রাচীনকে "সনাতন প্রথা"

বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানে আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। বর্ত্তমানে নানাপ্রকার হেতুবশতঃ বিবিধ সমস্তার উদয় হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ প্রাচীন পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানের যুগধর্ম্মের প্রভাববশতঃ নূতন আর্থনীতিক, রাজনীতিক কারণসমূহ দ্বারা প্রাচীন সমাজপদ্ধতি ভিত্তিহীন হইতেছে; নূতন সামাজিক, আর্থনীতিক সমস্যাসমূহ উদয় হইয়াছে—তাহার মীমাংসা পুরাতন পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নহে। নূতন উদ্দীপনা আসিয়া সমাজকে অভিভূত করিতেছে, তৎপ্রতি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সাধন না করিলে সমাজেরই ক্ষতি সম্ভব এবং তাহাও হইতেছে।

আজ আমরা প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া অতীতের দিকে অবলোকন করিতেছি বলিয়া জাতীয় জীবনে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যে সব জাতি পশ্চাৎগামী ছিল তাহারা অগ্রগামী হইয়া যাইল, আর ভারত "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" আছে। এই জন্যই আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, কি প্রকারে আমরা অগ্রগামী হইতে পারি, কি প্রকারে আমরা জগতের অগ্রভাগে গমন করিতে পারি?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে যে অভাব সৃজন করিয়াছে, শিক্ষা তাহার কতক পূরণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। আমাদের বংশগত চরিত্রে ও স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রভাব জন্য জাতীয় চরিত্রে যে সব অভাব আছে, নূতন শিক্ষা ও লালনের দ্বারা তাহার কতক পূরণ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত অগ্রে উক্ত

হইয়াছে শিক্ষা ও লালনের প্রভাব দ্বারা গৌণ ভাবে প্রকৃতির উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। শিক্ষা দ্বারা প্রাচীন ধারা হইতে বিভিন্নতা (mutation) আনয়ন করিতে হইবে। এই বিভিন্নতা দ্বারা নূতন রাস্তায় আমাদের জাতীয় জীবনকে অগ্রসর করাইয়া আমরা মুমূর্ষু অবস্থা হইতে পুনর্জীবিত হইতে পারি। এই জন্য চাই আমাদের নূতন শিক্ষা যদ্দ্বারা আমরা জগৎকে নূতন ভাবে গ্রহণ করিতে পারিব।

এই স্থলে একটি কথা বিচার্য্য। সর্ব্বদাই শুনা যায় যে ভারতের মুক্তি ও উন্নতি ভারতের সনাতন ধারানুসারেই সংসাধিত হইবে। এই মতাবলম্বী দল বলেন, ভারতীয় ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের নিয়ম জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় নহে, ভারতের সমস্যা সমূহও তৎদেশানুযায়ী পৃথক, ও তাহাদের নিরাকরণ ভারতীয় ধারানুসারেই হইবে (India is a peculiar country—her problems are peculiar to herself, and these demand a solution peculiar to India)। কিন্তু গোড়াতেই বিসমোল্লায় গলদ! ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্ত্তনের নিয়ম যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থল হইতে পৃথক তাহা কোন সমাজতত্ত্বীক বলিয়াছেন? আর ভারতের "সনাতন ধারা" যে চিরকাল অভঙ্গ ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ কোথায়? তৎব্যতীত ভারতের আটকোটি অধিবাসী যাঁহারা এই "সনাতন ধারার" কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাঁহারা জাতীয় কোন বিবর্ত্তনের

ধারার মধ্যে আসিবেন ? সমাতনপন্থী জাতীয়-কর্ণধারেরা এ বিষয়ের কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

অর্থনীতি তত্ত্বানুসারে অর্থনীতির নিয়মসমূহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয়, ভারতবর্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। অর্থনীতির উপর সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, এবং ভারতীয় সমাজতত্ত্বের বিবর্ত্তন কোন স্বতন্ত্র নিয়মানুসারে হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সব কার্য্য কারণানুসারে সমাজের বিবর্ত্তন হয়, ভারতেও তদ্রূপ ; ভারতে ও তাহার বাহিরে একই সমাজতত্ত্বীক আইন দ্বারা সমাজের ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সব আর্থনীতিক কারণসমূহ জন্য পৃথিবীর অন্যত্র বিভিন্ন সমস্যার উদয় হইতেছে, সেই সব আর্থনীতিক কারণ সমূহও এ দেশে উদয় হইতেছে ; এবং সমান প্রকারের সমস্যারও আবির্ভাব হইতেছে। তৎপর ব্যক্তিগত ভাবে ভারতের মানবের মন কি পৃথিবীর অন্যান্য মানব হইতে অন্য উপাদানে সৃষ্ট যে তাহার জন্য সৃষ্টি ছাড়া ব্যবস্থা করিতে হইবে ?

পরীক্ষা মূলক মনস্তত্ত্ব (experimental Psychology) এ বিষয়ে কি বলে ? এ পর্য্যন্ত কোন মনস্তত্ত্ববিদ আবিষ্কার করেন নাই যে ভারতবাসীর Sub-consc ous mind পৃথিবীর অন্য প্রকারের মানব হইতে পৃথক, আর ভারতবাসীর "power of abstraction," "power of reaction" প্রভৃতি অন্য প্রকারের মানব হইতে অদ্ভুত রকমের ! তবে মধ্যে একটা বুলী উঠিয়াছিল—

"East is east and west is west"

কিন্তু যিনি এই বুলীর স্থষ্টিকর্ত্তা, তিনি একজন ঘোর সাম্রাজ্য-বাদী—যাহার মানবের মধ্যে পার্থক্য দেখাই হইতেছে পেশা! কিন্তু ইহাতে ভারতের অস্তুতত্ত্বের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই। ভারতেও যাঁহারা "India is a peculiar country with peculiar problems" প্রভৃতি বুলী আবৃত্তি করিতেছেন তাঁহারাও পেশাদার ব্যক্তি! তৎপর, যাঁহারা ভারতের সনাতন পন্থার নামে দরবিগলিত ধারা হন তাঁহারা ভুলিয়া যান বা জানেন না যে, প্রাচীন বৈদিক যুগের ধারার পর বৌদ্ধ যুগের ধারা ও বিভিন্ন World-view প্রচলিত হয়! তৎপরে পৌরাণিকযুগে জাতীয় সংস্কার আর এক খাতে বাহিত হয়। ইহার পর মুসলমানযুগে আর এক ধারা বাহিত হয়, শেষে বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের চিন্তা নূতন ধারায় বাহিত হইতেছে, এবং মন একটা পরিবর্ত্তনের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া যাইতেছে। এই জন্য বলি, ভারতীয় সনাতন ধারার অর্থ কি? ইহা একটা লোক ভুলান ছেঁদো কথা নহে কি! সর্ব্বশেষে ভারতের আট কোটি অহিন্দুর জন্য কোন্ ধারার বন্দোবস্ত করা হইবে? তাহারা কি জাতীয় বিবর্ত্তনের মধ্যে নাই বা তাহাদের বাহিরে রাখা হইবে?

কথাটা এই, অন্ধকার সমাচ্ছন্ন অজ্ঞ প্রধান ভারতবর্ষে অনেকেই "অন্ধেরী নগরী, চৌপট রাজার" ন্যায় বিচরণ করিতে-ছেন, তাঁহারা এই সব পেশাদারি বুলী আবৃত্তি করিতেছেন এবং

"দেশোদ্ধারের" নানা প্রকার অদ্ভুত ও উদ্ভট মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দিতেছেন। কেহ বা দেশের লোককে "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাইবার" পরামর্শের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা বৈদিক যুগে পুনরাবর্ত্তন করিতে বলিতেছেন, কেহ বর্ত্তমানের শিক্ষাকে "গোলামী" বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন, কেহ বা নাক টিপিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে বলিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি! কিন্তু এই সব সনাতন-ধারাপন্থীরা এই সব উপায়ে দেশোদ্ধার করিতে আজ পর্য্যন্ত অসমর্থ হইয়াছেন বটেই, তৎব্যতীত তাঁহারাই তাঁহাদের উদ্ভটতা দ্বারা ভারতীয় সমস্যাকে "peculiar problem" করিয়া তুলিতেছেন।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অদ্ভুত দেশ নহে (সর্ব্ব দেশের লোকই নিজেদের বিষয়ে এবম্প্রকারের ধারণা পোষণ করে), তাহার সমস্যাও সৃষ্টিছাড়া নহে, এবং তাহার নিরাকরণও সৃষ্টিছাড়া উপায়ে সংঘটিত হইবে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজতন্ত্রের যে বিবর্ত্তন চলিতেছে ভারতেও তদ্রূপ হইবে। ভারতকেও সনাতন ধারার প্রাচীনত্ব ত্যাগ করিয়া নূতন World-View-রূপ mutation অবলম্বন করিতে হইবে। যদি ভারত বাঁচিতে চায়, যদি ভারত বর্ত্তমানের সমস্যাগুলির পূরণ করিয়া শিরোত্তলন করিয়া জগতে দণ্ডায়মান থাকিতে চায়, তাহা হইলে প্রাচীন সনাতন ধারানুযায়ী "নির্ব্বাণ তত্ত্বের" ও "মোহ-মুদ্গরের" প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া নূতন world-view গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতকে নূতন

যুগের নূতন উদ্দীপনা সমূহের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। আর কূপমণ্ডুপ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, জগতের মধ্যে আসিতে হইবে।

জগতের প্রতি এই নূতন ধারণা আনিবার জন্য আমাদের চাই তদনুযায়ী শিক্ষা। অবশ্য যে শিক্ষার বলে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় বর্ত্তমানে দৃষ্ট হইতেছে না। আমাদের দেশে না আছে একটা প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় আর না আছে একটা প্রথমশ্রেণীর পুস্তকাগার! আমাদের দেশে মুন্সেবীগিরি, দারগা-গিরি ও ওকালতি করিবার জন্য যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজন সেইটুকুই এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়! এবং এইটুকু বিদ্যালাভ করিবার জন্য ছাত্রজীবনের অনেক সময় বৃথাই ব্যয়িত হয়। যাঁহারা বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন তাঁহারাই আমার মন্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সর্ব্বপ্রকারের এবং উচ্চাঙ্গের চর্চ্চার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়াই আমাদের ছাত্রদের মনও পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বপ্রকারের বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় সর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই, এবং যথায় যৎটুকু আছে তাহা বিদেশের সহিত তুলনা হয় না। উচ্চ শিক্ষার অভাবে আমাদের ছাত্রদের মনও অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হইতেছে। বিজ্ঞান চর্চ্চাপেক্ষা ভূতের ও অলৌকিক গল্প আমাদের শিক্ষিত লোকেদের বেশী

প্রিয়, বিজ্ঞানসমূহের আধুনিক সংবাদাপেক্ষা কলানডয়েলের ভূতের গল্প আমাদের শিক্ষিত লোকেদের নিকট বিশেষ পরিচিত। এমনও দেখিয়াছি অনেক তথাকথিত শিক্ষিত যুবক অর্দ্ধঘণ্টা যুক্তিপূর্ণ কথা কহিতে সক্ষম হয় না, এই সময়ের মধ্যে সে পরস্পর বিরোধী, অসংলগ্ন, অর্থহীন কথা কহিবে। হিন্দুর মন একেই অযৌক্তিক ও পরস্পর বিরোধী চিন্তাদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তৎপর বর্ত্তমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাতে তাহা সংসাধিত হইবার কোন উপায় নাই। যে শিক্ষার কথা আমি এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি তাহা বর্ত্তমানে এদেশে দেখিতে পাই না, তবে যেটুকু প্রচলিত হইয়াছে তাহা প্রাচীনাপেক্ষা উদার—যদিচ ইহার দ্বারা ভারতের সভ্যতাকে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে বাঁচাইবার কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। ভারতের এ অবস্থা বিদূরিত করিবার জন্য চাই জড়বাদী চর্চ্চা materialistic culture ও উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা; কিন্তু উভয়েরই উৎকর্ষতা এদেশে এখনও সাধিত হয় নাই।

বর্ত্তমানযুগে আমরা জড়বাদ চাই। জড়কে আমরা নিজেদের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে চাই। জড় হইতে ভীত হইয়া তাহাকে দেবতার স্থানেও বসাইতে চাহি না; আর তাহার অস্তিত্বের অস্বীকার করিয়া জগত মিথ্যা বলিয়া জঙ্গলেও পলাইতে চাহি না। আমরা চাই জড় প্রকৃতির ধনসম্ভারকে ভারতবাসীর ভোগে লাগাইতে, বর্ত্তমান সময়ের জীবন সংগ্রামের পরাজিত যুবক ও বর্ত্তমান

ভারতের সঙ্কটময় অবস্থার জন্য নিরাশাপূর্ণ, উদ্যমবিহীন, অবসাদে ভগ্ন-হৃদয় যুবককে আশার কথা বলিতে চাই। তাহাকে বলিতে চাই, ভারতের বক্ষস্থিত প্রকৃতিদত্ত ধনসম্পদ তোমার ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তুমি তোমার মনকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত কর, নূতন শিক্ষালাভ কর, 'জগত সত্য' এইভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ কর, জগতকে নূতন চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে শিক্ষা কর, নিজের অধিকার বুঝিয়া লও, যাহা তোমার ন্যায্য দাবী তাহা তুমি পাইবে এবং তাহা ভোগ করিয়া ভারতকে আনন্দের স্থান করিয়া তোল।

এইজন্য চাই নূতন world-view বা welt-anschaung. যদি ভারতীয় ছাত্র ছাত্রাবস্থা হইতে জগতকে নূতনভাবে গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রও নূতন-ভাবে গঠিত হইবে। একটি জাতির World-View বদলাইয়া দিলে সেই জাতির ইতিহাসও পরিবর্ত্তিত হয়। এই সত্যের যুক্ততা চক্ষের সম্মুখে আমরা চারিদিকে দেখিতেছি। হে ভারতীয় যুবক, আর প্রাচীন ধারার গল্পের মোহে না মজিয়া নূতন world-view গ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনে নূতন কর্ম্মপদ্ধতির ধারা প্রবাহিত করিয়া দাও এবং তদ্বারা জাতীর ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ কর। আমাদের আর নেতি নেতি করিয়া নৈরাশ্যের মন্ত্র জপিলে চলিবে না, আমাদের অস্তি, অস্তি, রূপ আশার কথা কহিতে হইবে। আমাদের meliorist হইতে হইবে, জগতের উন্নতিকর, কারণ জগতের উন্নতি সাধন সম্ভবপর।

এই নূতন world-view আনয়ন করার জন্য তদুপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে উচ্চাঙ্গের শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে নাই। কেন নাই তাহার কারণ আমার নিকট অজ্ঞাত ; তৎপর সাধারণ জনমতও এ বিষয়ে উদাসীন! ব্যাপারটা হইয়াছে যে আমাদের শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যাতে পরিণত হইয়াছে। যেটুকু শিক্ষা পাইলে সরকারী দপ্তরে চাকরী প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইটুকুই সাধারণতঃ পাইবার ব্যবস্থা আছে এবং আমরাও সেই-টুকুরই কদর করি! সাধারণতঃ উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা নাই বলিয়া স্বভাবতঃ ছাত্রেরা ঐদিকে যায় না। ইহা জানি যে, এদেশে উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অর্থকরী কার্য্যে এখনও নিয়োজিত করা যায় না, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা আমাদের নিকট উচ্চ বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার নিদর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এই স্থলে উল্লেখ করিলে তাহা বুঝা যাইবে। সুইডেনের আপসালা (Upsala) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক লুণ্ডবর্গের সহিত যখন আমি দেখা করি, তৎকালে আমার পরিচয় কালে যখন আমি উল্লেখ করি আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তাহাতে তিনি প্রীতি সহকারে বলিয়াছিলেন "ভারতবাসীর পক্ষে বিজ্ঞানকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে।" উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানের চর্চ্চার অভাবে জগতে আমরা চর্চ্চিত জাতি বলিয়া সম্মান পাইতেছি না, এবং আমাদের মনও

তজ্জন্য এত পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া রহিয়াছে ! যে সময় আমেরিকায় পার্শিভাল লোয়েল দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা Mars গ্রহে দৃষ্ট জ্যামিতির ধরণের ঋজু রেখাগুলি জলের নালা কিনা এবং তথায় বুদ্ধিমান জীব আছে কিনা তাহার গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে আমরা গ্রহাদিকে পূজা করিয়াছি আর শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে তাহাদের আকাশপথ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি ! আবার যে সময় জার্ম্মাণি ও অন্যান্য দেশে মড়কাদি নিবারণের জন্য নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে সেই সময়ে আমরা সেই সব মড়কের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ওলাবিবির ও শীতলামাতার পূজা করি ; যে সময়ে স্নায়বীয় ব্যামোহ হইলে পাশ্চাত্য দেশে নূতন মনস্তত্ত্বানুসারে মনস্তত্ত্বীক বিশ্লেষণ দ্বারা স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য দূ করা হয় সেই সময়ে সেই প্রকারের রোগীকে আমরা ভূতগ্রস্থ বলিয়া ওঝ দ্বারা ঝাড়াইবার ব্যবস্থা করি।

এইজন্যই বলি আমাদের মনকে কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত করিবার জ ও উন্নত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন। যে জাতির মনে কপাট বদ্ধ থাকে, সে জাতির মস্তিষ্ক কুসংস্কারে পূর্ণ থাকে সে জাতির জাতীয় মুক্তিও সুদূর পরাহত হয়। জগতে মস্তিষ্কের লীলার খে হইতেছে ; যে জাতির মস্তিষ্ক যত প্রতিভাশালী, যে জাতি নিজের কা যত মস্তিষ্ককে খেলায়, বহুল বাধাবিঘ্ন উত্তরণ করিয়া সেই জাত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করাও অনিবার্য্য। এই কারণে, সনাতনবাদের ধরিয়া সর্ব্ব প্রকারের উদ্ভট মুষ্টিযোগ ও অজ্ঞদেশে ধর্ম্মান্ধতাকে ক্ষিপ্ত ক গোলে হরিবোল দিয়া দেশোদ্ধারের গল্প না ফাঁদিয়া বিজ্ঞানসমূহের চর্চ্চা

আমাদের মনকে মুক্ত ও উন্নত করিলে জাতীয় মুক্তির রাস্তা বরং নিকটবর্ত্তী হইবে।

আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি, উচ্চাঙ্গের চর্চ্চা করিবার সুবিধা এদেশে এখনও আসে নাই; এবং এদেশের যে সমস্ত ধনী সমাজে প্রাধান্য ও অধিকারের জন্য স্বাধীন দেশের অভিজাতদের নকল করেন, তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য মুক্ত হস্ত নহেন। তথাপি আমাদের এই চর্চ্চাকে স্বীকার করিতে হইবে এবং উচ্চ চর্চ্চার যুগ আমাদের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনমূলক কর্ম্মের একটি অঙ্গ। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিতে হইবে, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কেবল অর্থকরী বিদ্যার পশ্চাতে ধাবমান হইলে আর চলিবে না। আমাদের ত্যাগ স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইবে। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ অর্থস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন না, এবং পুরাকালে ভারতের পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন। আজ যাহারা ভারতীয় ছাত্রদের বর্ত্তমানের শিক্ষা "গোলামী শিক্ষা" বলিয়া ত্যাগ করিয়া বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, তাঁহারা জগতের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংবাদও রাখেন না আর বৈদিক যুগের সংবাদও কি রাখেন? ভারতে তরুণেরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা দ্বারা গোলামের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে অভিসম্পাৎ করিয়া চোরের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে ভাত খাইবার বন্দোবস্ত করিলে আমরাই ঠকিব; আমরা

বর্ত্তমান কালের জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া ইহজগত হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইব। আর বৈদিক যুগের জীবন বা আরবের যাযাবর পশুপালকের জীবন এ দেশে এযুগে যাপন করা কি প্রকারে সম্ভব হইবে!

যাঁহারা আমাদের গোলামী মনোবৃত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আক্ষেপ করেন, তাঁহারা কি এই বিষয়ে মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন? আমাদের গোলামী মনোবৃত্তির অনেক কারণ আছে এবং ইহার ভিত্তি অনেক পুরাতন কাল হইতেই পত্তন করা হইয়াছে; তবে শিক্ষা সম্বন্ধে যে গোলামীত্ব তাহা কি একদেশদর্শীতার দ্বারা সৃষ্ট হয় না? ইহার কারণ কি একটি ভাষা দ্বারা শিক্ষালাভের জন্য দায়ী নহে? ইংরেজী শিক্ষার দোষ নাই কিন্তু তৎসঙ্গে আরও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। একটি ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলে একদেশদর্শীতা দোষে দুষ্ট হইতে হয়। বিভিন্ন ভাষা দ্বারা একটি বস্তুর তুলনামূলক পাঠ করিলে একদেশদর্শীতা দোষে দুষ্ট হইতে হয় না; এই জন্যই সর্ব্ব সভ্য দেশের স্কুলে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গুটিকতক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদেরও বিদ্যাকে বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়া আহরণ করিলে মনের গোলামীর অন্তর্দ্ধান করিবে। আর চাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমাদের ছুটপাটি করিয়া বেড়ান ও পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনের সহিত একীভূত হওয়া। এইজন্য কবির ভাষায় বলি—

" দেশবিদেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান;
উঠাও নবতর সন্ধান॥"

আজ বাঙ্গালাপ্রদেশ সর্ব্ব বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশ হইতে পশ্চাৎগামী

হইয়াছে। "বঙ্গভাষীয় ব্যক্তির ভবিষ্যত অন্ধকার" এই রব বাঙ্গালী স্বজাতিভক্তেরা তুলিতেছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেবল অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বা বর্ত্তমান কালের পক্ষে বিভিন্ন উদ্ভট ব্যবস্থা করিলে কি সব সমস্যা মীমাংসা হইবে? এই সব ব্যবস্থা করিলে গোলাম জাতির নিকট হাততালী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বজাতীর কল্যাণ সাধন হয় না।

প্রাচীন অনেক দিন মৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে পূতিগন্ধময়, তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করার চেষ্টা বৃথা মাত্র। প্রাচীনের কার্য্যকরী শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা বর্ত্তমানের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া গমন করিতেছি। ভারতের এই বর্ত্তমানাবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাদের "এসিয়ার বর্ব্বরতা" হইতে বিমুক্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। চাই এক্ষণে আমাদের নূতন শিক্ষা, জগতের অতি নূতন ধারণা ও তদনুযায়ী কর্ম্মপদ্ধতি, আর আন্তর্জাতিক বিবর্ত্তনে ভাগ গ্রহণ।

এবম্প্রকারের মনোবৃত্তি ও কার্য্যপদ্ধতি আমাদের মধ্যে আনয়নের জন্য তাহার উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে তাহার কোন উদ্যোগ আমাদের মধ্যে নাই। যাহা আমরা বর্ত্তমানের শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা পাইতেছি না নিজেদেরই তাহার অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। নূতন ভাব-তরঙ্গ ছাত্রদের মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য বিভিন্ন স্থলে ছাত্রবৃন্দ মধ্যে উচ্চাঙ্গের চর্চ্চার আলোচনার্থে প্রথমতঃ পাঠকেন্দ্র বা study circle স্থষ্টি করিতে হইবে। যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে অনেক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব বোধ করেন বা তথায় যে সব

শিক্ষালাভ করার বন্দোবস্ত নাই, এই সব পাঠকেন্দ্রে সেই সব বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজেদের জ্ঞানের অভাব পরিপূরণ করিতে পারেন। এই প্রকারে দেশে একটা নূতন ভাবের ভাবুকের দল গঠিত হইবে যাহারা এদেশে, আন্তর্জাতিক ভাবের সহিত পরিচিত এবং চর্চ্চিত intelligentsiaর অভাব পরিপূরণ করিবে। যাহারা পাশ্চাত্যদেশের চর্চ্চিত মণ্ডলীর মধ্যে মিশিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনুযোগ করেন যে, এদেশে একটা চর্চ্চিত মণ্ডলী বা চর্চ্চিত আবহাওয়া পান না যাহার মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, ইঁহারা সকলেই intellectually stagnant হইয়া যান বলিয়া অভিযোগ করেন; পরে গতানুগতত্বের ন্যায় তাঁহাদের মৌলিক চিন্তাশক্তি ও ভাব সমূহ, নূতন আহার না পাইয়া বিনষ্ট হয় এবং তাঁহারাও "মোহমুদ্গর" আবৃত্তি করিয়া এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া নাতিগ্রীষ্ম নাতিশীতল ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদের নৃত্য দেখিবার আকাঙ্খায় থাকেন; আর বাকি ক্কচিৎ দুই একজনের ভারতীয় সূর্য্যরশ্মির প্রাখর্য্য বশতঃ মস্তিস্কে গোলমাল উপস্থিত হইলে তাঁহারও তাহাদের চেলারা এই cerebral disorderকে উচ্চাঙ্গের বা আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গের খেলা বলিয়া প্রচার করেন! ইহাই হইতেছে সাধারণতঃ বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের শিক্ষার পরিণতি! বড় দুঃখের কথা যে, পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমরা আধুনিক শিক্ষার সংস্রবে আসিয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত দেশে একটা intellectual atmosphere সৃষ্ট হয় নাই, যাহার মধ্যে থাকিয়া ভাবুকগণ নিজেদের ভাবকে জীবিত রাখিতে পারেন; এবং মৌলিকত্ব

হিসাবেও জগতে আমাদের দান বড় কমই হইয়াছে ! দ্বিতীয়তঃ এই সব study circleএর কার্য্যকে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক সমূহ সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মানবের ভাব ও চিন্তাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য জগতের নিত্যনূতন সংবাদ জানা দরকার ও ভাবের বিনিময় প্রয়োজন ; তৎব্যতীত তুলনামূলক পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নূতন ভাবের পুস্তক সমূহ বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য ভাষাতে ভাষান্তরিত করা আশু প্রয়োজন। যাঁহারা বিদেশীয় ভাষাতে ভাব সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাঁহাদের মাতৃভাষাতে সেই ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। আমাদের মাতৃভাষাতে নূতন ভাবের সাহিত্যের অভাব বলিয়াই আমরা চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছি এবং সেইজন্য "মোহমুদগর" ও "আনন্দমঠের" ভাবের উপর আমাদের ভাব-তরঙ্গ এখনও উঠে নাই। এবং কাহারও নূতন কথা শ্রবণ করিলেই আমরা ভয়ে চমকাইয়া উঠিয়া বলি "radical" "subversive"। চতুর্থতঃ আমাদের দেশে যাঁহারা ভাবুক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা রাখেন এবং যাঁহারা পণ্ডিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের ইংরাজী ব্যতীত আর দুইটী অন্ততঃ একটী জীবিত ইউরোপীয় ভাষার সহিত পরিচয় থাকা বিশেষ আবশ্যক। কতকগুটীক ভাষা জানিলে একটী ভাষাগত বিদ্যার উপর মোহ কাটিয়া যায় ও একদেশদর্শীতা নষ্ট হয় ; তৎপর তুলনামূলক পাঠের দ্বারা যে কোন একটী বস্তুর অধিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চমতঃ—নূতন ভাব সমূহের বাহন স্বরূপ বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করার আবশ্যক।

কারণ বিভিন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার জন্য কোন পত্রিকা আমাদের দেশে নাই। যাহা আছে তাহা সব প্রেমের গল্প ও ভুসমালের সরবরাহ করে এবং তাহার দ্বারাই সেই সব পত্রিকা vested interest সৃষ্টি করিয়াছে ও তজ্জন্য নূতনকে নিজের সন্নিকটে আসিতে দেয় না বা ভবিষ্যতেও দিবে না। আমাদের চাই বৈজ্ঞানিক পত্রিকা সমূহের প্রচার। ষষ্ঠতঃ ভারতীয় ছাত্রবৃন্দকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। প্রথমতঃ এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া তথাকার ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। সমস্ত সভ্য দেশের ছাত্রেরা সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের অভাব, অভিযোগ, আকাঙ্খা, দাবী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাত করায়। আমেরিকায় Student's unionগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty আর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। তৎপর ছাত্রদের শিক্ষানুযায়ী বিভিন্ন Society club প্রভৃতি স্থাপন করিয়া নিজেদের চর্চ্চার পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মণ্ডলীকে সংঘবদ্ধ করিয়া নিখিল-ভারতীয় ছাত্র সংঘঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রকে নিখিল ভারতীয় সংঘের একটী "chapter" (শাখা) রূপে গণিত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ নিখিলভারতীয় ছাত্র মণ্ডলীর বাৎসরিক কংগ্রেসের অধিবেশন প্রয়োজন। ইহা দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের ছাত্রেরা একতা সূত্রে বদ্ধ হইবে। সপ্তমতঃ ভারতীয় ছাত্র সংঘকে আন্তর্জাতিক ছাত্রআন্দোলন ও যুবকআন্দোলনের সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে। উক্ত প্রকারের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও কংগ্রেস সমূহে ভারতীয় ছাত্র

সংঘের প্রতিনিধি প্রেরণ আবশ্যক।

এবম্প্রকারে আমাদের দেশের ছাত্রেরা নূতন ভাবে প্রবুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হইয়া জগতের নূতন ব্যবহারিক সত্তায় জ্ঞানলাভ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, ভারতীয় সমাজ জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে যদ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

দেশকর্ম্মীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা।

নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে আমি উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, আমাকে বিবিধ যুবক সম্মিলনী অধিবেশনোপলক্ষে বঙ্গ প্রদেশের অনেক জেলায় পদার্পণ করিতে হইয়াছে এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে বক্তৃতাও করিতে হইয়াছে। এই সব কার্য্যোপলক্ষে আমায় অনেক প্রবীণ ও তরুণের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, তাঁহাদের মানসিক গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ নিকটবর্ত্তী হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধাও যথেষ্ট হইয়াছে এবং এই সঙ্গে অজ্ঞ শ্রমিকদেরও সংস্পর্শে আসিয়াছি। এইজন্যই আমার অনেক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, আমার ক্রমাগত পর্য্যটনের ফলে আমি কি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি? আমার অভিজ্ঞতা শিক্ষিত সাধারণের অবগতির জন্য এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে রাজনীতি. [illegible]নীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে অজ্ঞতা বিশেষভাবে অনুভব করিলা[illegible] [illegible] জীবনের যে কোন আন্দোলন কেবল গড্ডালিকা প্রবাহেই চ[illegible] [illegible]াহার পশ্চাতে যুক্তিবাদ ও প্রাণ নাই। দেশের যাহারা [illegible] ও চিন্তাশীল

ব্যক্তি তাঁহারা নিভৃতেই আছেন ; সাধারণ তাঁহাদের সন্ধানও রাখে না এবং তাঁহাদের চায়ও না ; কারণ তাঁহারা হুজুগে মাতিতে অরাজি। দেশে জাতীয় কর্ম্মে মৌলিক গবেষণার অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই। সকলেই ভাবেন, একটা ফাঁকতালে যাদু মন্ত্রে যদি হঠাৎ দেশটা স্বরাজ পায় ও উন্নত হয় তাহা হইলে সুবিধা হয় ; কিন্তু কষ্ট স্বীকার, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ করিয়া দেশকে উন্নত করিতে কেহ রাজী নহেন। অযৌক্তিক ভাবপ্রবণতাশীল হুজুগকেই সাধারণে আসল জাতীয় কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন। দেশকে উন্নত করিতে হইলে নীরবে কর্ম্ম করিয়া তিল তিল করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিয়া তদ্দ্বারা দেশোন্নতি ও স্বরাজ সংসাধন করিতে হইবে—এই সত্য এখনও সাধারণের বোধগম্য হইতেছে না।

তৎপর, দেশকে উন্নত করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বুঝাপড়া করিবার জন্য স্বার্থত্যাগের যে আদান প্রদান প্রয়োজন, তাহাও উপরিস্তন শ্রেণী সমূহ এখনও বুঝিতেছেন না। উপরের লোকেরা ভাবিতেছেন,—"আমাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ ষোল আনায় বজায় থাকুক, কেবল স্বরাজের মোহমন্ত্রের তেজে নিম্নের লোকেরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমাদের অধিকতর উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিউক।"

ইহার পর, যাহারা নেতৃস্থানীয় অথবা 'নেতা' হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মনোগতি দেখিয়া বোধ হয়, exploitation (শোষণ) নীতিই যেন তাঁহাদের মূলমন্ত্র। কি প্রকারে নিজের কার্য্য

হাসিল করিন এবং তজ্জন্য কাহার সঙ্গে জুটিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে, এই জন্যই ক্রমাগত দলাদলি, দলভঙ্গ ও আবার নূতন দলের জোট পাকান, প্রভৃতি স্বদেশ সেবার পন্থারূপে পরিণত হইয়াছে। দেশের কার্য্যে একদল আর একদলের বিরুদ্ধে ক্রমাগতই ষড়যন্ত্র করিতেছে ; উদ্দেশ্য— "নিজে" কি প্রকারে সাধারণের সম্মুখে নেতৃস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি। এই সব কারণ বশতঃ যেন Cliques and Intrigues দেশ স্বাধীন করিবার পন্থার স্থান অধিকার করিয়াছে।

তৎপরে কথা আসে, তরুণদের বিষয়। তরুণেরাই ভবিষ্যতের আশা ও ভরসার স্থল ; কিন্তু তাঁহাদের ভিতর সর্ব্ব বিষয়েই সাধারণ ভাবে একটা নির্লিপ্ত ভাব (Indifference) লক্ষিত হয়। দেশের কথা বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হয় না। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় একদল আছেন যাঁহারা দেশের কথা ভাবেন। কিন্তু তাঁহারা এখনও অন্ধকারে ঘুরিতেছেন। কেহ এখনও আনন্দমঠের রোমান্সের জাবর কাটিতেছেন, আর কেহ গান্ধিবাদ প্রভৃতি খদ্দরকে Fetish করিয়া দেশ সেবার চরম করিলাম বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে দুই একটী করিয়া তরুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যাঁহারা ইউরোপের আধুনিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য বিষয়ে পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা জাতীয় জীবনের পুনরুদ্ধারকল্পে যুক্তিবাদ প্রভৃতি একটা নীতির অনুসন্ধানে রত। হয়ত ইহাদের অনেকে dilettantism হিসাবে আধুনিক ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা পাঠে রত, তত্রাচ দুই একটী তরুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যাঁহারা

আধুনিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ফল দ্বারা স্বদেশের সমস্যাগুলি নিরাকরণের রাস্তার সন্ধানে ব্যাপৃত, আমার ভরসা তাঁহাদেরই উপর। এই তরুণেরা যদি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মৌলিক গবেষণার দ্বারা কালে, দেশে একটা নূতন দর্শনশাস্ত্র ও জাতীয় আদর্শ প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে সাধারণে আঁধারে আলোক দেখিতে পাইবেন।

বাঙ্গালার তরুণদের মনের অবস্থা কি প্রকার তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য অনেকে নিশ্চয়ই কৌতূহলী হইবেন। তরুণদের সহিত আমার জীবন চিরকালই ওতঃপ্রোত ভাবে লিপ্ত আছে। সেইজন্য আমি তাঁহাদের বিষয় কিছু বলিতে সাহস করি। ভারতের তরুণদের মন অতি সুস্থাবস্থায় আছে, তাঁহাদের মনে নানা আশা জাগিতেছে। কিন্তু বিদেশের যুবকেরা নিজেদের জীবনকে উন্নত করিবার জন্য যে সুবিধা স্বীয় সমাজে প্রাপ্ত হন, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা স্বীয় দেশে তাহা পান না। এইজন্যই তাঁহারা মুহ্যমান হইয়া আছেন। অন্ন-চিন্তাই সকলকার প্রধান চিন্তা। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রেরা বেশীর ভাগ সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন এবং দেশ তাঁহাদের জীবনের কার্য্যের ফলভোগ করিতে বঞ্চিত হয়। তৎপর পাঠদ্দশায় ছাত্রেরা যেটুকু দেশসেবা করেন, সেটুকু হুজুগে (ক্ষণিক) মত্ত হওয়াতেই পর্য্যবসিত হয়।

আমার নিকট আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ব প্রধান দোষ যাহা প্রতীত হয় তাহা স্থায়ী দৃঢ় প্রতিজ্ঞার (steady determination) অভাব। একটা কর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবার যে আবশ্যকতা আছে সেই ভাব বিশেষতঃ

বঙ্গবাসীদের মধ্যে অভাব। আমরা কার্য্য না করিয়া তাহার ফল লাভ করিতে চাই। তৎপর, তরুণদের মধ্যে যাঁহারা দেশের বিষয়ে ভাবেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা intensive feelingএর বিশেষ অভাব। যে আগ্রহ ও ভাবে প্রণোদিত হইয়া আমেরিকার এক যুবক প্যাট্রিক হেনরি বলিয়াছিলেন,—"Give me liberty or give me death." অথবা ফিলিপিনো ছাত্রেরা ও রুষীয় ছাত্রেরা দলে দলে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন,. ভারতের তরুণদের মধ্যে সেই আন্তরিকভাব বিদ্যমান নাই।

আজকাল দেশের সর্ব্বত্র রব উঠিতেছে, গণশ্রেণীকে উত্তোলন কর, এবং আমি যে সব সভা ও সম্মিলনীতে যোগদান করি, তথায় এই কল্পে কার্য্য করিবার জন্য মন্তব্যও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় কিন্তু কার্য্য করিবার কালে লোক পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জেলাতেই তরুণেরা সংঘবদ্ধ হউক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে এবং কমিটিও নিযুক্ত হইতেছে ; কিন্তু আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সেই সব মন্তব্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা হয় না। অবশ্য এই সব দেখিয়া আমার বোধ হয়, আমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে কর্ম্ম করিবার প্রবল স্পৃহার অভাব আছে। হয়ত ইহা আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জলবায়ুর দোষ। আমাদের milieu (পারিপার্শ্বিক অবস্থা) আমাদের শিথিল শরীর ও শিথিল মন গঠন করিয়াছে। তৎপর আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা আমাদের "হুজুগে" ও "ভাবপ্রবণ" করিয়া গঠিত করিয়াছেন, সেইজন্য সর্ব্ব বিষয়েই আমরা "মুষ্টিযোগ" অনুসন্ধান করি।

ইহার পর, আমাদের ভাবের ঘরে চুরি করা বিশেষ দোষ আছে। এই কারণ বশতঃই হিন্দুরা martyr (সহিদ) জাতিরূপে গণ্য হন না।

শেষে, ইহাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয় যে, আমাদের রাজনৈতিকেরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে "সহজিয়া" ধর্ম্মের ভাব বিশেষভাবে আনয়ন করিয়াছেন। কোন প্রকারের আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ বা কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষার প্রয়োজন নাই; এক টুকরা খদ্দর পরিধান করিয়া কোন বিশিষ্ট সভাসমিতির সভ্য হইলেই "দেশের কার্য্য" করিলাম বলিয়া হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এবং মাঠে বা রাজকর্ম্মচারীদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেই "দেশোদ্ধার" হইল—আমিও একজন বড় দরের স্বদেশ প্রেমিক বলিয়া গণ্য হইলাম বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হওয়ার ভাবই বিশেষভাবে প্রবল। রাজনীতিক্ষেত্রে এই সহজিয়া আমাদের তরুণদের আরও দুর্ব্বল করিতেছে। এই জন্যই স্বদেশীযুগের কর্ম্মী ও বর্ত্তমানের কর্ম্মীদের জীবনের প্রভেদ লক্ষিত হয়।

অনেকে আমাকে বলেন, আমি "নূতন কথা" কহি; তাঁহারা আমার কথা বুঝিতে পারেন না। তাহার প্রত্যুত্তরে আমি বলি, এইজন্য তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী, আমার কথার দোষ নাই! আমাদের দেশের নিরক্ষরেরা অজ্ঞ আছেন বটেই, আর তথা কথিত শিক্ষিতেরা তাঁহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ফলে অর্দ্ধশিক্ষিত হইতেছেন। একটা সাধারণ অর্থনীতিক ও সমাজনীতিক কথা যাহা পাশ্চাত্যদেশের under graduates ও শ্রমিকেরা জানেন তাহা এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট পর্য্যন্ত নূতন বলিয়া প্রতীত হয়! একে দেশে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার উপায় নাই, তৎপর

নেতারা দেশকে বিদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কাযেই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব কোথা হইতে আসিবে? কেবল ধর্ম্মান্ধতা ক্ষেপাইয়া মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিলে ভারত উঠিবেনা। ইহা দ্বারা অনেকে "অন্ধেরি নগরী, চৌপট রাজার" ন্যায় বিরাজ করিতে পারেন বটে, কিন্তু ভারত "যে তিমিরে, সেই তিমিরে" থাকিবে। এক্ষণে তরুণদের মনে সুস্থ ভাব দিবার জন্য, মৌলিক চিন্তার উদ্রেক করিবার জন্য intellctual revolution (ভাবের বিপ্লব) বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে ভবিষত বংশীয়েরা আঁধারে আলাক দেখিতে পাইবেন।

সম্পূর্ণ